সমাজ শিক্ষা সাহিত্য

ডঃ শুভঙ্কর চক্রবর্তী

প্রকাশক :
শ্রীসুধীর কুমার মণ্ডল
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৬১

প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত

মুদ্রাকর :
আনন্দমোহন দত্ত
নারায়ণী প্রেস
২৬/সি, কালীদাস সিংহ লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

তীক্ষ্ন বুদ্ধি আমার ভাইটির স্মৃতি
'এখনও............উজ্জ্বল উপস্থিতি'

সূচী ঃ

সমাজ

শিক্ষা

সাহিত্য

রাজনীতি ঃ ধর্ম ঃ ধর্মনিরপেক্ষতা

॥ ১ ॥

যদি এভাবে একটি সমীকরণ অংক করি,—

রাজনীতি + ধর্ম + রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয় = ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দল ও সংগঠন সৃষ্টির উৎসাহ, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও দাঙ্গার পুষ্টি, জাতীয় সংহতির সমস্যা ও বিপদ,—কেউ আপত্তি করবেন ?

ভারতীয় মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছিল এই সমীকরণের মধ্যে। হিন্দু-মহাসভা এই সমীকরণের সৃষ্টি। আর. এস্. এস্., জামাৎ-ই-ইসলামী, শিবসেনা, বিশ্বহিন্দু পরিষদ্, মাজলিস ইত্যাদি এই সমীকরণের ফাটলে ও কন্দরে বিষবৃক্ষ। আজও এই সমীকরণ দেশে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির চিন্তা কুরে কুরে খাচ্ছে। এই সমীকরণ থেকেই ধর্মীয় গোঁড়াতন্ত্র বিপজ্জনক শক্তির রূপ নিচ্ছে। ভারতের রাজনীতির খাঁজে খাঁজে এই সমীকরণ কাজ কবছে। এরই কূপ থেকে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর সাম্প্রদায়িক কুৎসিত মনোভাব দানোর মতো বেরিয়ে এসে বাহুযুদ্ধে এককে আরেক আহ্বান করছে। ১৯৪৬-এর বীভৎস কলঙ্কিত দাঙ্গার পেছনে এই সমীকরণ ছিল। ১৯৬১-র জব্বলপুরের দাঙ্গার, ১৯৬১-এর মহারাষ্ট্রের দাঙ্গার, ১৯৬১-এর আলিগড়ের দাঙ্গার, ১৯৬১-র হায়দ্রাবাদের দাঙ্গার, ১৯৬১-র সম্প্রতি মীরাট ও দিল্লীর লজ্জাজনক মূঢ়তার দাঙ্গার বড়ো কারণ এই সমীকরণ অংক। ভারতে ব্রিটিশ বৈদেশিক প্রভুত্ব স্থাপনের পর থেকে স্বাধীন ভারতে আজ পর্যন্ত সমস্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এই সমীকরণ থেকে রসদ সংগ্রহ করেছে।

প্রার্থনা করল এবং মজুত অস্ত্র হাতে নিয়ে হা-রে-রে রব তুলে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মা-বোনের ইজ্জত গেল, গৃহস্থের সম্বল গেল, ভাইয়ের হাতে ভাই বোনের প্রাণ গেল। হিন্দুরা যদি মুসলমান বিদ্বেষ থেকে ডাক দেয়—ধর্মযুদ্ধের জন্য তৈরি হও, নিজেদের সশস্ত্র করো; আর মুসলমানরা যদি হিন্দু-বিদ্বেষ থেকে তাদের সম্প্রদায়ের লোককে অনুরূপ আহ্বান জানায়, তবে সেই সাম্প্রদায়িক মারণ যুদ্ধ ঘোষণায় আমাদের দেশটার কী হবে? দেশটার ঐক্যবদ্ধ থাকার ধর্ম, সংহত থাকার আকাঙ্ক্ষা ও প্রবল প্রয়োজন যে সর্বস্বান্ত হবে।

অথচ সে-আহ্বানই তো আজ উঠছে। ধর্মক্ষেত্রে বারুদের গন্ধ, রক্তপাত, নরবলি আজ প্রত্যক্ষ। ধর্মীয় নেতারা রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে সমুদ্যত। এ সব অমঙ্গল ও বিপদ এই সমীকরণের গর্ভে পরিপুষ্ট হয়ে আসছে। মধ্যযুগে রাজায় রাজায় যুদ্ধ ছিল, কিন্তু সামাজিক জীবনে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দাঙ্গা হয়নি, বরং সমন্বয় হয়েছে। মুসলিম শাসনেও ভারতে ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়নি। সাম্প্রদায়িকতা ইংরেজদের হাতের প্রত্যক্ষ সৃষ্টিও নয়। সুচতুর ইংরেজ যা করেছে তা হলো, সাম্প্রদায়িকতার ইতস্তত কুয়াশাকে, বিচিত্ররকম বিকীর্ণ সূত্রকে যে কোনো রূপে, যে কোনো অবস্থায়, যে কোনোভাবে পেলেই ব্যবহার করেছে, তাকে ফুলিয়ে তুলেছে। সেই সূত্রেই এই সমীকরণের সৃষ্টি।

এই সমীকরণ ইংরেজেরই তৈরী। ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসেবে ভারতের অর্থনীতি এই সমীকরণ অঙ্কটা ফলাবার উর্বর ক্ষেত্র ছিল। অনুন্নত, অনগ্রসর, দরিদ্র উপনিবেশ এই দেশটার অর্থনৈতিক পীড়ন ছিল প্রবল। বরাবরই অর্থনৈতিক পীড়ন সব পীড়নের অক্ষদণ্ড। এই পীড়ন থেকেই ধর্মীয় পীড়ন, সাম্প্রদায়িক পীড়ন অন্ধকারের মতো নেমে আসে। ইংরেজ সর্বদা তার উপনিবেশ দেশে এই পীড়নকে বলবৎ রেখেছে। কোনো দিনই সে ভারতীয় জনগণের স্বার্থে দেশটার অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র বলতেন, ইংরেজ টাকা আদায় করে আর ডেসপ্যাচ লেখে, দেশ থাকে অবহেলিত। একথা বর্ণে বর্ণে সত্য। ইংরেজ শাসনের এই নিষ্ঠুর অবহেলায় কৃষিক্ষেত্রে সংকট এসেছে, হস্তশিল্প ধ্বংস হয়েছে, অর্থনৈতিক সংকটের গভীর ও ব্যাপক একটা ভিত তৈরি হয়েছে

ভারতবর্ষে। 'নির্ভেজাল একনায়কী' ইংরেজ শাসনে ভারতের মানুষ 'ইংরেজ আমলাতন্ত্রের লুঠ ও জবরদস্তির কবলে সমর্পিত ছিল'। [লেনিন] এই দুর্দশার জমিতে ভারতবাসীর মধ্যে স্বাধীনতার সংগ্রাম গড়ে উঠবে এবং ঐক্যের একটা প্রক্রিয়া দেখা দেবে—সুচতুর ইংরেজ তা জানত। এই প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ কায়েম রাখতে ও প্রভুত্ব পোষণের জন্য ইংরেজ ধর্ম ও রাজনীতির মিশ্রণের এই সমীকরণটাকে তৈরি করেছে। ইংরেজ শাসনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ভারতবাসীর রাজনৈতিক চিন্তা ও আন্দোলনের মধ্যে যদি ধর্মকে মিশিয়ে দেওয়া যায় এবং তাকে সরকারের দিক থেকে প্রশ্রয় দেওয়া যায়—অনৈক্যের শক্তিকেই দৃঢ়মূল করা যাবে। ইংরেজ পরিকল্পিতভাবেই তা করেছে। একটু দেখলেই বোঝা যাবে কী নির্ভাজ ইপ্সিত করা চক্রান্ত ইংরেজের, এবং কতো সহজে আমরা চক্রান্তের শিকারে পরিণত হলাম।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এদেশে মোটামুটি যে সদ্ভাব বিদ্যমান ছিল, ইংরেজ শুরুতেই তাকে আঘাত করল। আমাদের সংস্কৃতি চর্চায়, ইতিহাস চর্চায়, রাজনীতিক আন্দোলনে সুকৌশলে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাবোধ অনুপ্রবেশ করিয়ে দিতে শুরু করল ইংরেজই। আমাদের ভারত বোধে সাম্প্রদায়িক আবিলতা মাখিয়ে দিয়েছে ইংরেজ। এক মহাজাতিক ঐক্যবন্ধ ভারতের যে সুন্দর স্বপ্ন ও আবেগ স্বাধীনতার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটু একটু করে গড়ে উঠছিল, স্বাধীনতার জন্য আমাদের সংগ্রাম থেকে ধর্ম-নিরপেক্ষতার যে ঐতিহ্য উদ্ভূত হচ্ছিল তাকে দুর্বল করার অবদান ইংরেজের। ভারত সংস্কৃতির প্রাণের কথা হলো বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সূত্রের সন্ধান। এই বৈচিত্র্য ও ঐক্যবোধ কখনও ধর্মভিত্তিক নয়; এই বোধ সামাজিক শ্রেণী বিভেদ ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা। ইংরেজের চক্রান্ত ছিল ভারতসংস্কৃতি সম্পর্কে ভারতবাসীর এই উপলব্ধি ও সত্যজ্ঞানে উলটো পাক খাইয়ে দেওয়া। ইংরেজ এ কাজে সফল হয়েছিল। সেই পাকের বিপাকে ফেলে আমাদের দিয়েই প্রকট মিথ্যাটা বলিয়েছে যে, এই বৈচিত্র্য ধর্মভিত্তিক। আমাদের দিক থেকে সবচেয়ে বড়ো বিফলতা ও দুর্বলতা ছিল এই যে, এই ইতিহাস-বিকৃত মিথ্যাটায় আমরা সায় দিলাম। আর তখনই মূলত ধর্মীয় বিদ্বেষের

সাম্প্রদায়িকতার পথই পাকা করলাম। এতে যে জাতীয় নেতৃত্ব সায় দিয়েছে তার প্রমাণ আমরা হিন্দুযুগ মুসলমানযুগ, হিন্দুজাতীয়তা মুসলমান জাতীয়তা, হিন্দুসংস্কৃতি মুসলমানসংস্কৃতি—এসব বলে পাণ্ডিত্য করতে লাগলাম; আন্দোলন করতে শুরু করলাম। হিন্দুধর্ম সংস্কার-বাদীরা ভারত আত্মাকে খুঁজতে বার হলেন ভারতের অতীত যুগের মধ্যে, আর্য ঐতিহ্যের মধ্যে। মুসলমানরা পেছিয়ে থাকবেন কেন? মুসলমান সংস্কারবাদীরা সন্ধানে বেরুলেন পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাসের মধ্যে। দেশের রাম রহিম ভাইরা কিন্তু তখন দেশেরই মাটিতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে চাষ করছে, তাঁত বুনছে, মাছ ধরছে, আর বিদেশী শাসনের অত্যাচারে একই সঙ্গে জ্বলছে, পুড়ছে, মরছে। ধর্মসংস্কারবাদীরা হিতকর অবদান নিশ্চয়ই রেখে গেছেন। কিন্তু দূরপ্রসারী ক্ষতি যা করেছেন তা হলো সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদের প্রবণতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মন্থনে কিছু অমৃত উঠতে দেখে ইংরেজ যতো না ভয় পেয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি উৎফুল্ল হয়েছে যখন দেখল সাম্প্রদায়িক বিভেদের গরল উঠছে। বিভেদ সৃষ্টির এই বিষ পাত্রে ধরে ইংরেজ তা দিয়ে বহু ধর্মের ও সম্প্রদায়ের এই দেশে বিষের ঐ চতুরালী সমীকরণ অংকটা তৈরি করল। জন্ম দিল মুসলিম লীগের, হিন্দু মহাসভার—মুসলিম মৌলবাদের, হিন্দু মৌলবাদের। এই বিষ এতো দূর ক্রিয়া করল যে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যেও ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটল। কোনো কোনো বিপ্লবী নেতা জাতীয়তাবাদকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করলেন। রাজনৈতিক আবেগ ধর্মীয় আবেগের হাত ধরল। অনেক মহাপ্রাণ বিপ্লবীর লক্ষ্য ও আচরণের মধ্যে বৈসাদৃশ্য, স্ববিরোধ দেখা দিল। সুচতুর সাম্রাজ্যবাদ তাকে আরও কৌশলে কাজে লাগাতে লাগল। হিন্দু ও মুসলমানের নেতৃত্বের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ও স্বাতন্ত্র্য বোধ জাগিয়ে দেবার উদ্যোগ নিল। হিন্দু ও মুসলমানের বুকে খোন্দল করে এই সমীকরণ অংকটা পুঁতে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ দ্বিজাতিতত্ত্বের দু'খানা তলোয়ার বাড়িয়ে দিল। জাতীয় নেতৃত্ব তা কোমরে বেঁধে নিলেন। ইংরেজ সাফল্যে করতালি দিয়ে সেক্সপীয়র আবৃত্তি করতে লাগল—mischief thou art afoot। আর সেই সঞ্চারিত বিষক্রিয়ায় আমরা ক্রমশঃ এক

সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আরেক সম্প্রদায় তিক্ত, অসহিষ্ণু, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগলাম। কোমরবন্ধ তলোয়ার খুলে পরস্পরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলাম। এভাবেই ইংরেজের রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয়ে যে সমীকরণ তৈরি হলো, জাতীয় নেতৃত্বের সায়ে তা পরিপুষ্ট হলো। ইংরেজ বিভেদ সৃষ্টির খেলায় এখানেই ক্ষান্ত হলো না। যখন দেখল ধর্মীয় বিভেদকে সাম্প্রদায়িক বিভেদের শক্তি করে তুলে তাকে ইংরেজের স্বার্থরক্ষার কাজে বেশ লাগানো যাচ্ছে, ইংরেজ তখন সমাজের অন্যান্য বিভেদ খুঁজতে লাগল। অর্থনৈতিক পীড়ন থেকে অন্য যে সব পীড়ন আসে, যেমন আঞ্চলিক পীড়ন, জাতপাতের পীড়ন, নৈতিক পীড়ন, কুসংস্কারের পীড়ন, অনৈক্যের শক্তির পীড়ন ইত্যাদি, ইংরেজ সেই সমস্ত পীড়নকে বাণ্ডিল করে বেঁধে তাকে দেশবাসীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কাজে লাগলো। আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে লাগলাম। স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবল পিছুটান সৃষ্টি হলো। ইংরেজের যে লক্ষ্য ছিল—হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপন যেন মুক্তি সংগ্রামের শক্ত গণভিত্তি গড়ে তুলতে না পারে—সে লক্ষ্য সফল হলো। আমাদের সায়নীতি এবং ইংরেজের প্রশ্রয় ও বিভেদনীতি, এই দুয়ের আপোষেই এই সমীকরণ অঙ্কটা শক্তিমদমত্ত হয়ে উঠতে পারল।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের এই ছত্রভঙ্গের খেলায় সেদিন জাতীয় কংগ্রেসের সম্মিলিত জাতিসত্তার ও রাষ্ট্রিক মহাজাতি সৃষ্টির অঙ্গীকার বিপন্ন হলো। ইংরেজের ধর্ম ও রাজনীতি সমীকরণের এই হলো সার্বিক চরম সর্বনাশ। এই সর্বনাশের শিকারে পরিণত হওয়া আমাদের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা ছিল ; এবং স্বাধীনতার শুভকর্মের ভেতরের মস্ত একটা বাধা ছিল। কংগ্রেস নেতৃত্ব অনেকেই এই দুর্বলতার সর্বনাশটা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু বাধাটা নিজেদের ভেতরেই ছিল বলে তাকে কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর ছিল না। দেশের সচেতন অগ্রণী মানুষ যাঁরা, সাম্রাজ্যবাদী নোংরা খেলার বিরুদ্ধে ছিলেন যাঁরা, তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তখন বিশ্বব্যাপী যে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া চলছিল তার জাগরণী প্রভাবে প্রভাবিত কমিউনিস্ট রাজনীতিকরা এবং কিছু কংগ্রেস রাজনীতিক এই সমীকরণ সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। এ বিষয়ে পরাধীন দেশের শ্রেষ্ঠ

নাগরিক ও সমকালীন বিশ্বের বহিমান ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের সতর্কতা, বেদনা ও বিশ্লেষণ ঐতিহাসিক সত্যতা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন, কংগ্রেস ক্রমশঃই ব্যর্থ হচ্ছিল সকল প্রদেশের সকল সমাজের ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত এক মহাজাতিকে জাগিয়ে তুলে রাষ্ট্রিক মহাজাতির গাড়িটাকে তীর্থে পেঁছে দিতে। বরং কংগ্রেসের হাতে গাড়িটা জীর্ণ হয়ে পড়ছিল। 'জীর্ণ গাড়িটার চাকাগুলো বিশ্লিষ্ট, মড়্মড়্ ঢল্ঢল্ করে যার কোচ্বাক্স, জোয়ালটা খসে পড়বার মুখে, তাকে যতক্ষণ দড়ি দিয়ে বেঁধেসেঁধে আস্তাবলে রাখা হয় ততক্ষণ তার অংশ-প্রত্যংশের মধ্যে ঐক্য কল্পনা করে সন্তোষ প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু যেই ঘোড়া জুতে তাকে রাস্তার বের করা হয় অমনি তার আত্মবিদ্রোহ মুখর হয়ে ওঠে'। [কংগ্রেস প্রবন্ধ] এসবই ইংরেজের বিষের সমীকরণে কংগ্রেস রাজনৈতিক নেতৃত্বের সায়দানের ফলশ্রুতি।

এই সমীকরণ অঙ্কটার বিষাক্ত উত্তরাধিকার নিয়ে আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলাম।

॥ ২ ॥

স্বাধীন ভারতের প্রথম কাম্য ও শ্লাঘ্য কর্তব্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই ধর্ম+রাজনীতি+রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয়ের সমীকরণ অঙ্কটাকে দেশের বুক থেকে টেনে তুলে তার পিছুটান কেটে দেওয়া—কঠোর কঠিন হাতে ; সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। দেশের গভীরে প্রোথিত এই সর্বনাশটা নির্মূল করার একটাই প্রশস্ত পথ ছিল। সে হলো অর্থনৈতিক পীড়ন থেকে সদ্য-স্বাধীন দেশটাকে মুক্তি দেওয়া। জনগণের জীবনের সকল পীড়নের, অসম্মানের, অন্ধকারের উৎস এই অর্থনৈতিক পীড়নটা বন্ধ করতে অর্থনৈতিক মুক্তিযজ্ঞে ব্রতী হওয়াই ছিল কাম্য। ইতিহাসে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বর্ণবিদ্বেষের দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের দাঙ্গা, জাতপাতের হানাহানি থেকে একমাত্র সেইসব দেশই তার জনগণকে মুক্তি দিতে পারছে যারা অর্থনৈতিক মুক্তির যজ্ঞের বিপ্লবে দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুঁজিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারছে। স্বাধীন ভারতে শাসকদল কংগ্রেস অর্থনৈতিক মুক্তিযজ্ঞে ব্রতী হবার যথার্থ পথ নিল না। কৃষিপ্রধান ভারতের ভূমিসংস্কারের কাজে অগ্রণী হওয়ার রাজনৈতিক ইচ্ছা

দেখালো না। উৎপাদন সংকট দেখা দিল। এবং তজ্জনিত নানা সংকট উদ্ভূত হলো। প্রাক্‌স্বাধীনতা সমস্যাগুলির গোড়া উৎপাটিত না হওয়ায় ইংরেজের রেখে যাওয়া ঐ সমীকরণটাকে আঘাত করতে পারল না শাসকশ্রেণী ও কংগ্রেস, বরং সাম্রাজ্যবাদী সমীকরণ অঙ্কটাকেই গ্রহণ করে তার নতুন নামকরণ করল **ধর্মনিরপেক্ষতা**। বহু ধর্মের এই দেশ ভারতবর্ষে ধর্ম-নিরপেক্ষতা খুবই কাম্য ছিল। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার যে ব্যাখ্যা দেওয়া হলো তা সর্বনেশে, ক্ষতিকর। এর অর্থ করা হলো—সব ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের সমদৃষ্টি, সমসম্মান প্রদর্শন; রাষ্ট্র কর্তৃক ধর্মের সমান তোষণ ও প্রচার। প্রয়োজনে রাষ্ট্র বিভিন্ন ধর্মীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি নিরপেক্ষ বিদ্যোৎসাহিতা দেখাতে পারবে। ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে বললেন, রাষ্ট্রের কোনো নিজস্ব ধর্ম থাকবে না ঠিকই, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কখনই ধর্মবিযুক্ত বা অ-ধার্মিক রাষ্ট্রচিন্তা নয়। কারণ তাঁর মতে, ধর্ম হলো সমস্ত নৈতিকতার ভিত্তি। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের এক ধরনের সমন্বয় থাকবে।

সমন্বয় সৃষ্টির এই চেষ্টা থেকেই ভারত সরকারের ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা ধর্ম-রাজনীতি-রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয়ের আশ্লেষে এক মোদকমণ্ডের রূপ ধারণ করল। এখানেই ইংরেজের সমীকরণ অঙ্কটার বিষাক্ত উত্তরাধিকার—সে-দিনের সায় ও প্রশ্রয়ের চেহারা বদলমাত্র। মুখের আদল অবিকলই রয়ে গেল। দূরদর্শী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস-সতর্ক দেশপ্রেমিক মানুষ, কোনো কোনো রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে বামপন্থী দলগুলি হুঁশিয়ারি দিয়ে বললেন, ধর্মনিরপেক্ষতার এই ব্যাখ্যা বিকৃত, এই ধারণার পথেই ইংরেজের সমীকরণ কায়েম হবে, 'ধর্মের মতো স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে এই ভ্রান্ত ব্যাখ্যা মূলতঃ ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তিগুলিকে উৎসাহিত করবে', ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মতো বর্তমানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দেশের ভেতরের এইসব শক্তিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবে। তাতে করে দেশ অস্থির হবে, জাতীয় ঐক্য বিপন্ন হবে। কিন্তু শাসকদল এই হুঁশিয়ারি শুনল না। পরন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার এই ধারণা পোষণ করেই ভারতের রাষ্ট্রপ্রধানরা, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যীয় মন্ত্রীরা, রাজনৈতিক নেতারা ধর্মীয় স্থানে পরিক্রমা করার অভ্যাস বাড়াতে থাকেন,

ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সামাজিক অনুষ্ঠানকে একাকার করে ফেলেন; ধর্ম স্থানে দাঁড়িপাল্লায় একদিকে বসে সোনায়, রূপায়, মুদ্রায়, পুষ্পে ওজন হতে থাকেন; দান করেন হীরা, সোনার অলংকার, টাকা। প্রার্থনা করেন সপারিষদে। সচিত্র এক সংবাদে প্রকাশ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী একটি শিবমন্দিরের শতবার্ষিকীতে পুরোহিতের হাত থেকে পূর্ণকুম্ভ গ্রহণ করছেন। ভারত সরকার হিন্দু মৌলবাদীদের খুশী করে মনে করেন সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি নিরপেক্ষ হলেন। আবার মুসলিম গোঁড়াতন্ত্রকে সন্তুষ্ট রেখে মনে করেন সংখ্যালঘুদের প্রতি নিরপেক্ষতা দেখানো গেল; দুই-এ দুই-এ ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া গেল। মুসলিম মহিলা বিল পাশ, রাম জন্মভূমি, বাবরি মসজিদের বিরোধ সমস্যা এই ধারণাজাত, এই দুই-এ দুই-এ ধর্ম-নিরপেক্ষ হওয়া।

আবার যখন নির্বাচন আসে, নির্বাচনের রাজনীতিতে মন্দির মসজিদ গীর্জাকে, মৌলবাদী শক্তিগুলিকে প্রকাশ্যে কাজে লাগায় শাসকদল। এ সবই সে করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কায়েম রাখতে। কিন্তু তার ফলশ্রুতিতে আজ দেশজুড়ে অনৈক্যের সব শক্তি বিপজ্জনক রূপ নিয়েছে। হিন্দু মৌলবাদ, মুসলিম মৌলবাদ, খৃষ্টান মৌলবাদ, শিখ মৌলবাদ নানাভাবে শক্তি সংগ্রহ করেছে। এক মৌলবাদ বনাম আরেক মৌলবাদ লজ্জাজনক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রশাসনের মধ্যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিষক্রিয়া ঘটছে। ১৯৬১তে মীরাটের দাঙ্গায় পুলিশ প্রশাসন সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্নতা থেকে ভাগ হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রাজ্য সশস্ত্রবাহিনী হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার নির্লজ্জ ভূমিকা নিয়ে দাঙ্গায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। ভারতের ঐক্য অখণ্ডতা স্থিতিশীলতার পক্ষে এ দুর্লক্ষণ। দেশের ছাত্রদের মধ্যে, শ্রমিকদের মধ্যে, গ্রামের গরিবদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদকামী শক্তি সংগঠন গড়ে তুলেছে। সংবাদ এজেন্সির মধ্যে তারা প্রভাব বিস্তার করছে। এমন কি শাসকদল কংগ্রেসের মধ্যেও এই শক্তি তার ক্ষমতাকে নেতৃত্বের স্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জাতীয় পরিষদের বৈঠক কার্যকর হচ্ছে না, দাঙ্গার বিরুদ্ধে এ্যাকশন প্ল্যান রূপায়িত হচ্ছে না। এ সবই রাষ্ট্রীয় জীবনে শাসক-শ্রেণী ও শাসকদল কংগ্রেসের বহুধা ভুলনীতি অনুসরণের সঙ্গে ধর্ম-নিরপেক্ষতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা থেকে সৃষ্ট। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-

বাদের সমীকরণের সেই টোপ যে গিললাম, আজও সুতো সমেত সেই বঁড়শিটা ভারতবর্ষের শরীরে রয়ে গেল। বঁড়শির সুতো হাতের কাছে পেয়ে আজও সাম্রাজ্যবাদ তাতে টান দিচ্ছে, ভারতের চোয়াল ছিঁড়ছে, সনাতন শরীরটা যন্ত্রণায় বেঁকে বেঁকে উঠছে। বঁড়শিটা শরীর থেকে উপড়ে ফেলে ভারতবর্ষকে আরাম দিতে পারল না কংগ্রেস।

বস্তুতপক্ষে কংগ্রেসের পক্ষে তা আর সম্ভবপরও নয়। সেদিন যেমন কংগ্রেস পারেনি হিন্দু মুসলমানের স্থায়ী ঐক্য স্থাপন করতে, স্বাধীন ভারতেও কংগ্রেস ব্যর্থ হয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়, প্রদেশ ও জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে ভারতের অগ্রগতির গণভিত্তি সুদৃঢ় করতে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য যে ধর্মনিরপেক্ষতা, তার ওপর বিষের ছোবল মারছে ধর্মীয় মৌলবাদী সর্প। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বলে ঘোষণার দাবী করছে ; জামাত-ই-ইসলামী চাইছে স্বাধীন ধর্মীয়রাষ্ট্র ; শিখ মৌলবাদ খালিস্তানের শ্লোগান তুলেছে। ক্রমশ আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হচ্ছে যে কংগ্রেস পার্টি কখনওই পারবে না বহুজাতিক সংহতির সবুজ তটে ভারতকে পেঁৗছে দিতে।

॥ ৩ ॥

ধর্মনিরপেক্ষতার যে ধারণা হিতকর তার যথার্থ অর্থ হলো, রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ। ধর্ম সম্পর্কে রাষ্ট্রের কোনো গরজ থাকবে না। ধর্মকেও রাষ্ট্রের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করতে হবে না। ধর্ম হবে ব্যক্তির ও সম্প্রদায়ের ইচ্ছানুযায়ী আচরণীয়। সরকারের কাজ হবে সকল নাগরিকের ধর্মীয় বিষয়ে বিবেকের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা। এর অন্যথায় কোনো দেশে কখনও সাম্প্রদায়িক শক্তির দানোটা নিষ্পিষ্ট হয়ে বধ হয় না। উল্টে তাদের চাগিয়ে দিয়ে সুদে খাটিয়ে নেয় দেশী বিদেশী শত্রু, সাম্রাজ্য-বাদী শক্তি। এদের মল্লযুদ্ধে দেশ দুর্বল হয়, অস্থির হয়, সংহতি বিপন্ন হয়, দেশবাসীর সর্বনাশ হয়।

এই হুঁশিয়ারি দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল ও শাসক পার্টি কংগ্রেস শুনছে না। কংগ্রেস তার মৌলিক শ্রেণীনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার বিকৃত ব্যাখ্যা আঁকড়েই রইল। এই অপব্যাখ্যার ফাঁক ও ফোকরে কংগ্রেস

সাম্প্রদায়িক বিরোধের স্পর্শকাতর উপাদানগুলিকে জিইয়ে রাখছে। প্রয়োজন মতো, সুবিধা বুঝে বুঝে সেসব উপাদান ব্যবহার করছে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ সাধন করতে। সম্প্রতি কেরলের নির্বাচনে তা লক্ষণীয় হয়েছে। শাসক পার্টি কর্তৃক ধর্ম ও রাজনীতির একীকরণের এই প্রকাশ্য প্রশ্রয় দানের ঘটনায় স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগের ঐতিহাসিক দুর্বলতাকেই স্বাধীন ভারতের বিপজ্জনক দুর্বলতা করে জাগিয়ে রাখা হলো। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমীকরণ অঙ্কটার বিষ প্রকাশ্যে বলীদর্পে ধর্মনিরপেক্ষতার নতুন পাত্রে ঢেলে রাখা হলো। স্বভাবতই ঐ পুরাতন বিষের সঙ্গে আনুষঙ্গিক হয়েছিল বিভেদের যত সব বোধ—সে সবগুলি ধর্মনিরপেক্ষতার পাত্রে এসে জমা হলো। এই বিচিত্র মিলিত বিষের ক্রিয়ায় আজ ভারত জ্বলছে। পর্যায়ক্রমে দাঙ্গা হচ্ছে গুজরাটে। জাতপাতের দাঙ্গার সঙ্গে সংঘটিত হচ্ছে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। মীরাট জ্বলে, আমেদাবাদ জ্বলে, দিল্লীর মুখ কালিমালিপ্ত হয়। গান্ধীজী সহস্রবার গুলিবিদ্ধ হন। ভারত সমাজের মৌল ভিত্তিটাই ক্ষয়ে যাচ্ছে। শাসক পার্টি কর্তৃক ধর্মনিরপেক্ষতার এই বিকৃত ব্যাখ্যা ও ধারণা স্বাধীন ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটনের অন্যতম প্রধান কারণ। ভারতের জাতীয় সংহতির বড়ো বাধা, সমস্যা ও বিপদ আজ কংগ্রেসের কাছ থেকেই এসেছে।

অথচ ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা একটা দেশকে সাম্প্রদায়িকতা বিভেদকামিতা থেকে কিভাবে মুক্ত করতে পারে তার বড়ো নজীর সোভিয়েত রাশিয়া। ১৯১৭ অক্টোবর বিপ্লবের তিনমাসের মাথায় ১৯১৮-র ২৩ জানুয়ারি লেনিন ধর্ম ও ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্র ব্যাপার থেকে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ধর্ম প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথকীকরণের ডিক্রি জারি করলেন। এই ডিক্রি রাশিয়ার সকল নাগরিকের বিবেকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করল। নাগরিকের ধর্মাচরণ করার অধিকার ও ধর্মবিমুখ থাকার অধিকার সুরক্ষিত হলো। সোভিয়েত রাশিয়ায় ধর্মবিশ্বাসীদের ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করার যে কোনো চেষ্টা কিংবা ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, বিদ্বেষ, হিংসাত্মক উত্তেজনা সোভিয়েত আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ। এই অপরাধে ছ'মাস থেকে এক বছর শোধনমূলক সশ্রম কারাদণ্ড হতে পারে অথবা সামাজিক নিন্দা কিংবা পঞ্চাশ রুবল পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-

সাম্প্রদায়িক শক্তির জন্ম সমাজতান্ত্রিক যে কোনো দেশে কল্পনার বাইরে। ধর্মনিরপেক্ষতার এই সঠিক ও প্রকৃত ব্যাখ্যার নীতি ছিল বলেই হিটলার ব্যর্থ হয়েছিলেন সোভিয়েত রাশিয়ার ১০০টি জাতি ও বহুধর্মের মানুষকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। বরং হিটলারের নাৎসী আক্রমণে দেখা গেল সোভিয়েতের সকল জাতি ও ধর্মের মানুষ ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি পরিবারের মতো শত্রুর মোকাবিলা করল। মুসলমানদের ছেলে মেয়েরা অ-মুসলমান ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে একত্র হয়ে তাদের অভিন্ন মাতৃভূমির জন্য সংগ্রামে অতুলনীয় বিস্ময়কর বীরত্বের পরিচয় রাখল। হাজার হাজার উজবেক ও কাজাখ, আজারবাইজানীয় ও তাজিক, তাতার ও কিরগিজীয়, তুর্কমেন ও বাশ্‌কিরারা তখন মস্কো ও ওদেসা, কিয়েভ ও মিন্‌স্ক, লেনিনগ্রাদ ও স্তালিনগ্রাদ—ভ্রাতৃপ্রতিম প্রজাতন্ত্রগুলির মাটিতে একই সঙ্গে লড়াই করে অম্লান বীরত্বের গৌরব অর্জন করলো। [সোভিয়েত দেশে ইসলাম ও মুসলিম সমাজ—জিয়াউদ্দীন খান ইবনে ঈশান বাবাখান]

সংস্কার : কুসংস্কার : নতুন সংস্কার

বহু পরিবারে দেখেছি সন্তানরা বাড়ি থেকে বেরুবার সময় বোলে বেরোয় —'মা যাচ্ছি'। মা প্রত্যুত্তরে বলে, 'যাচ্ছি বলতে নেই, এসো গিয়ে।' এ হলো মা'র সংস্কার, সন্তানের সংস্কার।

গ্রামে দেখেছি, কয়েকদিন বাড়িতে থাকার পর সন্তান যেদিন দূরে কর্মক্ষেত্রে ফিরে যায় মা রাস্তা পর্যন্ত এসে সন্তানকে রওনা করিয়ে দেয়। চোখের জল মা ফেলে না, অন্যে ফেললে নিষেধ করে। অশ্রুপাতে সন্তানের অমঙ্গল হবে। উদ্গত অশ্রু সংযত করার পারিবারিক আপ্রাণ চেষ্টায় এক বিধুর দৃশ্য রচিত হয়। এও সংস্কার।

আমার ৫২ বছরের বড়ো ভাই আজও সিগারেট খেতে খেতে ৮২ বছরের বাবার সামনে পড়ে গেলে ত্রস্ত সিগারেট লুকিয়ে ফেলেন; মুখের ধোঁয়াটা গিলে ফেলে সংকোচে দাঁড়িয়ে থাকেন। বাবা সন্তানকে অস্বস্তি থেকে রক্ষা করতে তুরন্ত সরে যান। সে এক অদ্ভুত কমনীয় দৃশ্য। এও পুত্রের সংস্কার।

শিক্ষকের সামনে ছাত্র ধূমপান করছে, এ ঘটনা আমাদের সমাজে গ্রাম শহরে এক রকম দেখাই যায় না। অতি দুর্বিনীত ছাত্রও একাজ করতে কদাচিৎ সাহসী হয়। এ হলো ছাত্রের সংস্কার। এর অন্যথা ঘটলে শিক্ষক আহত হন। সেও শিক্ষকের সংস্কার।

কদিন আগে এক মুসলমান পরিবারে বিয়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। বর-কনে দুজনই আমার ছাত্র। আমাকে দেখতে পেয়ে ত্রস্ত আসর ছেড়ে উঠে এসে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। আমি কল্যাণ কামনা করলাম। উৎসব বাড়ির উজ্জ্বল আলোয় ছাত্র শিক্ষকের মিলনের দৃশ্যটিকে অভ্যাগতরা সপ্রশংস গ্রহণ করলেন। অপূর্ব এক তৃপ্তিতে আমি ভরে উঠলাম। এ হলো ছাত্রের সংস্কার। শিক্ষকের সংস্কার।

বিজয়া দশমীর দিনে কোলাকুলি, প্রণাম; ঈদ উৎসবে কোলাকুলি;

খ্রীস্টমাস উপলক্ষে সজ্জিত নকল বৃক্ষরোপণ, অভিনন্দনলিপি প্রেরণ—এসবও সংস্কার।

ফোঁটা সাজিয়ে বোন বসে আছে ভাই কখন আসবে। কখন সে যমের দুয়ারে কাঁটা পুঁতবে যাতে কাঁটার বাধা পেরিয়ে মৃত্যু ভাইকে ছিনিয়ে নিতে না পারে। এ সংস্কারটি মমতার চন্দনে সুরভিত, প্রীতিসুধা। **কিন্তু এসব কি কুসংস্কার? এসব কি বাতিল করবো?**

অপরদিকে এক বন্ধুকে দেখলাম তার দু'হাতের দশ আঙুলের ছ'টিতেই রত্নখচিত আংটি। লজ্জিত হয়ে বললো, রাহু শনির দশাভীতি দূর করতে ধারণ করেছি। এ হলো বন্ধুর সংস্কার। এভাবে গ্রাম শহরে মানুষ চাকরির জন্য, কন্যার বিয়ের জন্য, রোগমুক্তির জন্য, ব্যবসায়ে সাফল্য কামনায় ব্যাপকভাবে রত্ন মাদুলি কবচ তাবিচ ধারণ করছে, তুকতাকে বিশ্বাস করছে; স্বর্গ-নরক পরলোকে আস্থা বাড়ছে; ভাগ্য-বরাত-পয়া-লাকি মেনে চলছে—এসবও সংস্কার। চন্দ্র সূর্যকে রাহু গিলে ফেলছে; শাঁখ কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে অমঙ্গলকারী রাহুকে তাড়ানো যায়—এই বিশ্বাসও সংস্কার। মানুষের কান্নায় দৃক্‌পাত নেই কিন্তু বেড়ালের কান্না অগ্রাহ্য করা চলবে না। এও সংস্কার। কলকাতা শহরে এক মিনিবাসে দেখলাম, চালকের সামনে এক লোহার শলাকায় পর পর গেঁথে রাখা হয়েছে লেবু, কাঁচা লঙ্কা। পথ দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাবে। এও বাস চালকের সংস্কার। সংসারে আমাদের মেয়েদের জীবনে বিভিন্ন সংস্কার সবচেয়ে বেশি দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে। অনেক মুসলমান পরিবার দেখেছি প্যাঁচার ডাক শুনলে অমঙ্গল থেকে উদ্ধার পাবার জন্য 'কুলহু আল্লাহ'র সুরা পড়েন। এও সংস্কার। অন্ধ ধর্ম বিশ্বাস, গোঁড়ামি, জাতপাতে বিশ্বাস, বর্ণবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, নারী নির্যাতন, পণপ্রথা—এসবও সংস্কারের হরেক রূপ। **কিন্তু এসব কি কুসংস্কার? এসব কি বর্জন করবো?**

এসব নিশ্চয়ই কুসংস্কার। কিন্তু আগেরগুলো সংস্কার। কুসংস্কার ও সংস্কারের মধ্যে একটা নীতি ও একটা স্পষ্ট সীমারেখা টানা দরকার। কুসংস্কার ভাঙতেই হবে। ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক ও সমাজ জীবনে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চাই। কিন্তু সংস্কার সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। কুসংস্কারের নাম করে সব সংস্কারকেই ভেঙে উড়িয়ে,

দেবার আধুনিকতায় পরিবার ও সমাজের কাম্য বন্ধনগুলিই ভাঙছি কিনা ভালোভাবে ভেবে দেখতে হবে। সতর্ক না হোলে মূল্যবোধকে ভাঙার একটা চক্রান্তের শিকারে আমরা পরিণত হব। সংস্কার মানেই কুসংস্কার নয়। সংস্কার কথাটাকে আমরা কুসংস্কারের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছি। আমরা যখন বলি 'এসব তোমার সংস্কার', 'লোকটা সংস্কারের ডিপো', 'উনি সম্পূর্ণই সংস্কারমুক্ত মানুষ'—তখন মূলত কুসংস্কারকেই বোঝাই। কুসংস্কার ও কাম্য সংস্কারকে বিচার করতে হবে মানুষের অনুকূলে সংস্কারের সেবাযোগ্যতার মানদণ্ডে ওজন কোরে। একটা বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা, নৈতিকতাবোধ, রীতি ঐতিহ্য যখন সামাজিক মানুষের মধ্যে বদ্ধমূল হয়, সংস্কারের জন্ম হয়। কিন্তু বদ্ধমূল বিশ্বাসের এই সংস্কার যখন মানুষের পক্ষে, মানুষের পরিবার ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হয়, মানুষকে সেবা করার যোগ্যতা হারায় তখনই তা কুসংস্কার হয়ে ওঠে। অপর পক্ষে যতক্ষণ তা হিতকর থাকে, সামাজিক ভূমিকা পালনের যোগ্যতায় জীবন্ত থাকে, তা কাম্য সংস্কার হয়ে ওঠে। মানবীয় সুন্দর সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত হোলে সংস্কারগুলি সর্বদাই মানুষকে সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনে বেঁধে রাখে এবং মূল্যবোধের গুণাবলী হয়ে ওঠে। ঐ যেসব সংস্কারের উল্লেখ করা হলো, কালভেদে দেশভেদে এসবের অন্যথা হতেই পারে। কারণ শাশ্বত কোনো সংস্কার হয় না, সার্বজনীন কোনো নৈতিকতা নেই। কিন্তু আমাদের বর্তমান এই সমাজ এইসব সংস্কারকে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন হিসেবে এখনও গণ্য করছে। সন্তানের, ছাত্রের আচরণে, ব্যবহারে প্রাসঙ্গিক সংস্কারগুলিকে সমাজ খুবই কাম্য সাধারণ শিষ্টাচার ও শ্রদ্ধাভাব হিসাবে মূল্য দিয়ে আসছে। এইসব সংস্কার কতোটা যুক্তিগ্রাহ্য ও বিশ্বাস্য তার চেয়ে বড়ো করে দেখতে হবে এই সব সংস্কার মেনে চলায় মানুষ অসম্মানিত হচ্ছে কি না, তার আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তি খর্ব হচ্ছে কি না, এসব সংস্কার ঘরে ঘরে সন্তানকে দুর্বল করছে কিনা, তার জীবনের শক্তি কেড়ে নেয় কিনা, তাকে ক্ষয় করে কিনা, সমাজ পরিবর্তনের লড়াইতে সন্তানকে পিছু টানে কিনা। তা যদি করে এসব সংস্কার বর্জন করতেই হবে। যদি না করে, এই সব সংস্কার বাতিল করার অর্থ দাঁড়াবে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনকে শিথিল করা। শিথিল পরিবার ও সমাজ সন্তানের

পক্ষে হিতকর নয়। কুসংস্কার এই ক্ষতিই সাধন করে। বুদ্ধির বিনাশকারীরূপ যেমন কুবুদ্ধি, ক্ষতিকর পরামর্শ যেমন কুপরামর্শ, কুপুত্র যেমন হৃদয়শেলের মতো, কুমন্ত্রণা ও কুরাজা যেমন রাজ্য ধ্বংস করে, অনুরূপভাবে কুসংস্কার মানুষকে অসম্মান করে, মানুষকে দুর্বল করে, মানুষের যুক্তি-তর্ক বিচারক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস কেড়ে নিয়ে তাকে অলৌকিকতা ও নিয়তি নির্ভর কোরে তোলে। কুসংস্কার মানুষকে তার দুরবস্থা ও দুঃখ যন্ত্রণার কারণ অনুসন্ধানে বাধা দেয় এবং কারণ দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণে নিষ্ক্রিয় করে। মানুষকে কুরে কুরে খায় কুসংস্কার। বিশ্ববিজয়ী, অমিত শক্তিধর মানুষ ফুরিয়ে যেতে থাকে। এই সব দুর্বল অসহায় মানুষ যতোই চমৎকার ও প্রতিভাসম্পন্ন হোক না কেন এদের দিয়ে কোনো বড়ো কাজ হয় না। এরা এতোটা নেশাগ্রস্তের মতো হয়ে ওঠেন যে কুসংস্কারকে যুক্তিতর্ক বিজ্ঞান দিয়ে গ্রহণীয় প্রমাণ করতে নামেন। এমন সায়েন্স ডিগ্রীধারী পণ্ডিত দেশে বিস্তর রয়েছেন যারা বিজ্ঞানের মন্ত্র পড়িয়ে অন্ধ সংস্কারকে বিজ্ঞানের সিঁড়িতে তুলতে কুণ্ঠিত হন না। যখন তা পারেন না, 'এসব ব্যক্তিগত ব্যাপার' বোলে এড়িয়ে যান ; সমালোচনা করা বা হস্তক্ষেপ করা পছন্দ করেন না! বিচ্ছিন্নতার স্পর্শকাতর একটা তন্তুজালে নিজেদের ঘিরে রাখেন। ঐ যেসব কুসংস্কারের উল্লেখ করলাম, এসব ক্ষতিই করে।

সংস্কারের এই বন্ধনকারী শক্তি ভেঙে দেওয়া এবং কুসংস্কারের এই সর্বনাশা শক্তি জিইয়ে রাখা বহু যুগের প্রাচীন ও পরিকল্পিত একটা চক্রান্ত। কে করছে এই চক্রান্ত? আমরা যে সমাজটায় বাস করছি সেই সমাজ ব্যবস্থাটাই এই চক্রান্তকারী। এই সমাজটাই কুসংস্কারকে মান্য করার প্রবণতা সৃষ্টি করে দেয়, নতুন চেহারায় পুরাতন কুসংস্কার এবং নতুন নতুন কুসংস্কার সৃষ্টি করে। অপর দিকে মানবীয় বন্ধনের কাম্য সংস্কার ভেঙে দিতে উৎসাহিত করে। এই চক্রান্তটা আমরা লক্ষ্য করি না, ভেবে দেখি না, পায়ের দিকে তাকিয়ে আমরা চলি না। অথচ প্রতিনিয়ত জীবন দিয়ে আমরা বেশ বোধ করছি আমাদের পরিবারে ও সমাজে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের বন্ধনগুলি শিথিল হচ্ছে, মানবীয় গুণাবলী পদতলে পিষ্ট হচ্ছে। বস্তু-জগতের যতো মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে তার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানবজগৎ ও মানবীয় সম্পর্কের অবমূল্যায়ণ ঘটছে, এসব বেচাকেনায় পরিণত হচ্ছে। এ

সমাজে একজন অন্য জনের শ্রমে অর্জিত মূল্য চুরি করতে পারে। চুরি করা অর্থে জীবন ধারণ করতে পারে। মহামান্য আদালত চোরকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে পারে। এ সমাজে দেখছি অর্থের সম্পর্কে সব সম্পর্ক বাঁধা। অর্থমূল্যে বিবেক কেনা যাচ্ছে, যৌবন কেনা যাচ্ছে, মেধা প্রতিভা কেনা যাচ্ছে। পিতামাতা সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক, স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক, দেশপ্রেম-দেশভক্তি, বিশ্বাস শ্রদ্ধা স্বার্থত্যাগ সবই অর্থের বন্ধনে আবদ্ধ। এই বন্ধন যতো কষে আঁটা হচ্ছে, মানবীয় সম্পর্কের বন্ধন ততো শিথিল হচ্ছে। অর্থের প্রতাপ লক্ষ মুখ দিয়ে মানুষের মেহনতের রক্ত শুষে নিচ্ছে, মানুষের সমাজের মধুর কমনীয় সম্পর্কগুলি চেটে চেটে খেয়ে নিচ্ছে। মানুষ হতাশ হচ্ছে, অসহায় বোধ করছে। একজনের কাছ থেকে আরেকজন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

হিংস্র ভীষণ অসুস্থ এই সমাজটারই নাম বুর্জোয়া সমাজ। ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা থেকে এর জন্ম। এই সমাজেই আমরা সন্তান-সন্ততি নিয়ে বাস করছি এবং প্রেয় ও শ্রেয় হারাবার আশংকায় প্রতিমুহূর্তে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকছি। আমাদের ভারত-সমাজে আবার 'ডবল' অসুস্থতা এসেছে। এখানে অর্থব্যবস্থায় অতীতের সামন্তবাদের সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু ধনবাদের অস্বাস্থ্যকর সমঝোতা হয়েছে। এর ফলে একদিকে সামন্তযুগের কুসংস্কার, আরেকদিকে ধনবাদের দুরারোগ্য ক্ষয়—এই দুই মিলে মিশে এমন একটা নোংরা জমি তৈরী হয়েছে যেখানে কুসংস্কার বেড়ে উঠবেই এবং মানবীয় সুন্দর সংস্কার নিষ্ঠুরভাবে আক্রান্ত হবেই। অনেক আগাছার শেকড় যেমন ফসলের ক্ষেতে ঢুকে সাজানো ক্ষেত শুকিয়ে দেয়, সেভাবে এ সমাজের কুসংস্কার পরিবারে ঢুকে শান্তি-আনন্দ-স্বপ্ন কেড়ে নেয়, পরিজনের মধ্যে মূল্যবোধহীনতার সংকট সৃষ্টি করে, পদে পদে মানুষকে আদর্শচ্যুত করে।

এই জন্যই কুসংস্কার সামাজিক শত্রু। ঠিক মিত্রকে চিহ্নিত করার মতো, ঠিক শত্রুকে চিহ্নিত করার মতো সংস্কার ও কুসংস্কারকে চিহ্নিত করা বাঞ্ছনীয়। কীভাবে তা করা যাবে? ঐ সীমারেখাটা ধরে এবং সামাজিক সচেতনতা ও বিজ্ঞান বুদ্ধি মেনে। যেমন শিক্ষককে, পিতামাতাকে মান্য করার ও শ্রদ্ধা করার সংস্কার যদি এই বদ্ধমূল বিশ্বাসের রূপ নেয় যে

গুরুজনরা সকলরকম প্রশ্নের ঊর্ধ্বে, তাঁদের কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিঘাত করা শিষ্টাচার বিরোধী, তবে গুরুজন মান্য করার সংস্কার কুসংস্কার হয়ে উঠতে পারে এবং তা এই ক্ষতিকর কুসংস্কারে রূপান্তরিত হতে পারে যে দেশের রাজাও সব অন্যায়ের ঊর্ধ্বে। মধ্যযুগে একটা বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল 'king can do no wrong' রাজা কোনো অন্যায় করতে পারে না। এই সংস্কারের সুযোগ নিয়ে রাজা অন্যায়ে অত্যাচারে শোষণে স্বৈরাচার করার ছাড়পত্র পেয়েছিল। এর কোনোরকম বিরোধিতা রাজদ্রোহ হিসেবে আখ্যাত ও দণ্ডনীয় বলে গৃহীত হয়েছিল। এই বিপদের আক্রমণ থেকে সংস্কারটিকে পারিবারিক ও সামাজিক কাম্য সংস্কারে রক্ষা করা যাবে যদি একে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের, শিক্ষক ও ছাত্রের দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়ার সম্পর্কে ও সহনশীল গণতান্ত্রিক চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এর জন্য আজ ধারাবাহিক ভাবনা দরকার। ভাইফোঁটার কমনীয় সংস্কারটি যদি ভাইবোনের মধ্যে দেবতাভীতি বা 'জীবনমৃত্যু বিধাতার দান'—এই বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেয় তাহলে কুসংস্কারের বিপদ বাড়বে। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান-বুদ্ধির প্রহরায় সংস্কারটিকে পরিবারগত মমতার বন্ধনে রক্ষা করা যায়। মিলনের পথ থেকে মানুষকে সরিয়ে আনাই কুসংস্কারের কাজ। কিন্তু সুন্দর সংস্কার মিলনের সরণি রচনা করে দেয়। এই পথ কেটে, ফাটিয়ে নষ্ট করে দেওয়া এই সমাজের একটা সুচতুর চক্রান্তও বটে। এই চক্রান্ত করবে তারা যারা আমাদের পক্ষে অহিতকর এই সমাজ ব্যবস্থাটাকে টিকিয়ে রাখতে চাইবে। স্থিতাবস্থা রক্ষার পক্ষে একটা শিথিল পরিবার ও সমাজ খুব সাহায্য করে ও দুর্বল আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ যথেষ্ট সহায়তা করে। এই জন্যই কুসংস্কার জিইয়ে রাখা হয়; সুন্দর সংস্কারের বন্ধনকারী শক্তি বিনষ্ট করা হয়; সংস্কার ও কুসংস্কারের ধারণা গুলিয়ে দেওয়া হয়।

কলকাতা শহরে দেখছি বিড়লারা বহু অর্থব্যয়ে তারামণ্ডল নির্মাণ করে বিজ্ঞানের হিতকর সংস্কারে মানুষের কল্যাণ করছে। তারই অনতিদূরে বিড়লারাই বহু অর্থ ব্যয়ে দেবমন্দির নির্মাণ করে মানুষের মধ্যে দৈব-বিশ্বাসের কুসংস্কার সৃষ্টির পথ কি কেটে দিচ্ছে না? বিজ্ঞান ও দৈব-বিশ্বাসের এই সহাবস্থানের যোগবিয়োগে আমাদের সন্তানরা কোন্

মূল্যবোধে বড়ো হবে? রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে যেমন ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে হবে, বিজ্ঞানকেও ধর্ম অধ্যাত্মবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে হবে। বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে আঁতাত কুসংস্কার বাড়াবেই। এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি এই সমাজ ব্যবস্থাটারই পরিকল্পিত সৃষ্টি। এই সমাজে এমন স্বামী-পুত্র রয়েছে যারা কর্মক্ষেত্রে অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করে, কিন্তু পরিবারে স্ত্রী পীড়ন করে, পিতামাতার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। এ সমাজে এমন শ্রমিক রয়েছে যে কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামে বীরের মতো লড়ছে কিন্তু গ্রামে ফিরে নিজের জমিতে জনমজুরকে শোষণ করছে, হরিজন নির্যাতন করছে। গণ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করছে যে মধ্যবিত্ত, সে-ই নিজের জমিতে বর্গা অপারেশনে বাধা দিচ্ছে। এই স্ববিরোধিতা এই সমাজ ব্যবস্থারই অবশ্যম্ভাবী বিষময় প্রভাব। দেশের মানুষদের যদি এই স্ববিরোধী চরিত্র করে তোলা যায়, এই সমাজটার অধিপতিদেরই লাভ হবে। একথা সামাজিক কঠোর সত্য বলেই জনগণের যে চমৎকার ও অগ্রসর অংশ সমাজ পরিবর্তনের লড়াই করছেন তাকে এই প্রদীপ্ত সত্যটা বুঝতেই হবে। এই চক্রান্তটা ধরতেই হবে এবং নিজেদের এই প্রবল চক্রান্তের তৃণাচ্ছাদিত ফাঁদ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। মুক্তিজয়ী শ্রেণীর কাছে কোনটা শৃঙ্খল কোনটা নয় তা স্পষ্ট হওয়া চাই। সেও এক কঠিন লড়াই। এই সত্যের উপলব্ধি আয়ত্ত হলে আকাঙ্ক্ষিত নতুন সমাজ কায়েম করার সংগ্রামে সংস্কার ও কুসংস্কারের ভূমিকা এবং সীমারেখা সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব হবে। সুন্দর সংস্কারের ও নীতিবোধের আকাঙ্ক্ষা ও ধারণা না নিয়ে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভব নয়। নভেম্বর বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় এবং চীন বিপ্লবের আগে চীন দেশে এই সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। এর মোকাবিলা করতে লেনিন ও মাও সে তুং সংস্কার ও কুসংস্কারের যথার্থ ভূমিকা নিরূপণে ভুল করেন নি। মাও সে তুং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে চীনের জনগণকে যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন এবং সুন্দর সংস্কার ও নীতিবোধে তাদের উদ্বুদ্ধ হ'তে আহ্বান জানিয়েছিলেন। লেনিন মনে করতেন—সুন্দর সংস্কার ও নীতিবোধের উদ্দেশ্য হলো সমাজকে উন্নততর স্তরে উঠতে সাহায্য করা, শ্রমিকশ্রেণীর উপর শোষণের অবসান করা। সুন্দর সংস্কার বর্জিত অথচ কুসংস্কারে নিমজ্জিত মানুষের ওপর কোনো

বড়ো কাজে, সমাজ পরিবর্তনের মতো সংগ্রামে আস্থা রাখা কঠিন। শোষক ও শাসকশ্রেণী ওৎ পেতে থাকে এদের মধ্য থেকে দালাল ও ঠ্যাঙাড়ে টেনে নেবার জন্য। মানুষে মানুষে মিলনের মধুর সংস্কার টিপে মেরে ফেলে মানুষে মানুষে বিরোধের কুসংস্কার প্রবল করেছে এই বৈরী সমাজটা।

আমাদের দেশেও কুসংস্কার বাড়ছে। সামন্ত-বুর্জোয়া কুঅভ্যাসগুলি যুবকদের, ছাত্রদের, শ্রমজীবী মানুষদের কলুষিত করছে, পরিবার ও সমাজ বন্ধনকে শিথিলতর করছে। এমনকি অগ্রসর অংশও এর প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। স্বার্থান্বেষী শ্রেণী এইসব কুসংস্কারকে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহার করছে। এর দ্বারা শ্রমজীবী মানুষের ওপর শোষণকে কায়েম করছে। এই পরিস্থিতিতে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী লড়াই হয়ে উঠবে। এ লড়াইতে উন্নত নতুন সংস্কারের সৃষ্টি খুবই সহায়ক হবে।

কী রকম হবে এইসব কাম্য নতুন সংস্কার? যেমন প্রেম ও বিবাহের ক্ষেত্রে নতুন সংস্কার কী রকম হওয়া বাঞ্ছনীয়?

নারী পুরুষের 'প্রেমের স্বাধীনতা', 'প্রেমের পরিতৃপ্তি', 'হৃদয়ের মুক্তি' —এসব ধ্যানধারণা বুর্জোয়া কুসংস্কারের রূপ পরিগ্রহ ক'রে দেশের যুবকদের মধ্যে প্রবল হয়েছে। যুবকদের যদি বলা হয়, প্রেমে দুটি জীবন জড়িত থাকে এবং একটি তৃতীয় জীবনের উদ্ভব ঘটে, অতএব সংযত হও, যৌবনোচিত স্বাস্থ্য ও শক্তির অপচয় ক'রো না, তাতে সমাজের প্রতি কর্তব্য ভ্রষ্ট হবে—একথাকে অনেকে নীতিসুধা ও বয়স্কের সেকেলে সংকীর্ণতা বলে ব্যঙ্গ করবে। দয়া করে একটু সময় করে শুনবে না, পড়বে না। কাছে বসিয়ে শোনাতে বা পড়াতে গেলে ঘন ঘন ঘড়ি দেখবে। এই আচরণ হলো বুর্জোয়া সমাজেরই কদর্য প্রভাবজাত। এই সমাজ প্রেম ও বিবাহের সামাজিক গুরুত্ব ও তা থেকে সমাজের প্রতি কর্তব্যের অনুভূতিকে পদপিষ্ট ক'রে চলে। প্রেমের স্বাধীনতা ও হৃদয়ের মুক্তি এই সমাজে দেহের কুসংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজে এমনটাও লক্ষ্যগোচর হচ্ছে যে নারী পুরুষ প্রেমের স্বাধীনতা ও হৃদয়ের মুক্তির নামে স্বামী স্ত্রী বিনিময় করছে। একালের কিছু কিছু লেখক এই বিকারকে উৎসাহিত

করছে। সামন্ত সমাজের গল্প ছিল,—কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত স্বামীকে কোলে ক'রে পতিতার ঘরে পেঁছে দিয়ে স্ত্রী সতীসাধ্বীর দৃষ্টান্ত রেখেছে। জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার সেই দৃষ্টান্ত বুর্জোয়া সমাজে প্রেমের স্বাধীনতা ও হৃদয়ের মুক্তির নামে নতুন ক'রে ঘটছে। এর বিরুদ্ধে প্রেম ও বিবাহের ক্ষেত্রে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের ধারণা সন্তানের মনে বদ্ধমূল ক'রে দেওয়া খুবই কাম্য। সুন্দর এই ধারণাই সুন্দর সংস্কার হয়ে বিকশিত হবে। মানুষ তাতে আকৃষ্ট হবে, তাকে চয়ন করবে, রক্ষা করবে। যতোদিন মানুষের সেবা করতে পারবে ততোদিন তা সমাজবৃন্তে তাজা থাকবে। ব্যর্থ হ'লে ঝরে পড়বে। প্রেমের এই নতুন সংস্কার ছিল লেনিনের কাম্য। লেনিন যখন বলেন, "প্রেমে দুটি জীবন জড়িত এবং একটি তৃতীয় জীবনের উদ্ভব ঘটে", তখন তিনি যুবকদের যে সংস্কার ও নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ করতে চান সে হলো প্রেম ও বিবাহের সামাজিক গুরুত্ব ও তা থেকে সমাজের প্রতি কর্তব্যের সংস্কার। প্রেমের ক্ষেত্রে অধঃপতিত নারীপুরুষ নতুন সুন্দর সমাজ কখনো গড়তে পারে না। এ বিষয়ে ক্লারা জেৎকিন ও লেনিনের মধ্যে আলোচনা খুবই প্রণিধানযোগ্য। লেনিন ক্লারাকে বলছেন, "তুমি সেই যুবক কমরেডকে চেনো তো? চমৎকার ছেলে, অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন। কিন্তু তবু আমি মনে করি, কোনো ভালো কিছু তার দ্বারা হবে না। একটা প্রেম থেকে আরেকটা প্রেমে সে হাবুডুবু খাচ্ছে। এসব ক'রে রাজনৈতিক সংগ্রাম হয় না, বিপ্লব হয় না। যে সব মহিলা তাদের ব্যক্তিগত রোমান্সের সঙ্গে রাজনীতি জড়িয়ে ফেলেন, আমি তাদের বিশ্বস্ততা এবং সংগ্রামে ধৈর্যের প্রতি আস্থা রাখতে পারি না। যে সব পুরুষ প্রতিটি পেটিকোটের পিছু নেয় কিংবা যারা প্রতিটি যুবতীর ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে তাদের উপরও আস্থা রাখা যায় না। না, না! বিপ্লবের সঙ্গে এসব খাপ খায় না। লেনিন প্রায় লাফিয়ে উঠে টেবিলে একটা থাপড় মেরে ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন।" [Lenin—The Man (Reminiscences of Lenin)]

এ হলো যৌনজীবন সম্পর্কে বুর্জোয়া সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেনিনের সুন্দর সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা। এভাবেই বুর্জোয়া ক্ষয়িষ্ণু

সমাজের সর্বনাশা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানবীয় সম্পর্কের সুন্দর সংস্কার ও নীতিবোধের বাসনা কাম্য।

যেমন শান্তির সংস্কার। আমাদের সন্তানদের মধ্যে যদি শান্তির জন্য নিবিড় কামনা সৃষ্টি করা যায়, যদি সন্তানদের বুকে এই গভীর প্রত্যয় বদ্ধমূল করা যায় যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ মানবসভ্যতার শত্রু—যতকাল সাম্রাজ্যবাদের আপদ থাকবে, এই প্রিয় পৃথিবী থেকে যুদ্ধের বিপদ দূর হবে না—সে বিশ্বাস রূপ নেবে মহত্তর শান্তির সংস্কারে। এই সংস্কারে পরিপুষ্ট সন্তান যখন বিজ্ঞানী হবে, সাহিত্যিক হবে, রাষ্ট্রনায়ক হবে তার মন থেকে শান্তির সংস্কার দূর ক'রে তাকে অন্যায় যুদ্ধের কুসংস্কারে পূর্ণ ক'রে দেওয়া কঠিন হবে।

যেমন সমাজতন্ত্রের সংস্কার। সমাজতান্ত্রিক সংস্কার আরেক নতুন কাম্য সংস্কার। আমাদের সন্তানরা অভিজ্ঞতায় দেখছে তারা যে সমাজ ব্যবস্থায় বাস করছে সেখানে চাকরি নেই, স্বাস্থ্য নেই, শিক্ষা নেই, সুখ নেই, শান্তি নেই। তাদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মেছে, এই সমাজটায় মানবজন্মের সার্থকতা নেই। এ সমাজটা দিয়ে তবে কী হবে? কিন্তু এরই পাশে তারা শুনছে, জানছে যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যথার্থ সুখ আছে, শান্তি আছে, নিরাপত্তা আছে। জীবনের মূল্য আছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তাদের আস্থা ও আগ্রহ বাড়ছে। সমাজতান্ত্রিক আবেগ তাদের মধ্যে বদ্ধমূল ক'রে তুলতে পারলে তা সমাজতান্ত্রিক সংস্কারের রূপ নেবে। এই সংস্কারই প্রতিকূল বৈরী সমাজটা ভেঙে ফেলে নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে সন্তানদের উজ্জীবিত করবে।

এভাবেই সমাজের কাছে দায়বদ্ধ থাকার সংস্কার, শ্রমকে সম্মান করার সংস্কার, কাজ করার সংস্কার, গণ-উদ্যোগ সৃষ্টির সংস্কার, গণ-কর্তব্য পালনের সংস্কার, সংঘশক্তির সংস্কার, দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকার সংস্কার —এসবই হবে সমাজবন্ধনকারী কাম্য সংস্কার। কেবল নিজের স্বার্থ নয়, অপরের স্বার্থরক্ষা সম্পর্কে সচেতন হবার সংস্কার, বিনয়ী বিনম্র হবার সংস্কার, মান্যকে মান্য করার সংস্কার, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা ভালোবাসার সংস্কার সুন্দর সংস্কার হিসেবেই গণ্য হবে। নিজের পরিবারকে দেশকে ভালোবাসার সংস্কার, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক হবার

সংস্কার নিশ্চয়ই সুন্দর সব মূল্যবোধের সংস্কার। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সংস্কার, ভারতীয় অখণ্ডতা রক্ষার সংস্কার, শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ও প্রতিশোধ গ্রহণের সংস্কার হলো সামাজিক বন্ধন রক্ষার সংস্কার। এমন একটা বিশ্বাসে যদি সন্তানরা বড় হোতে পারে যে, যে সমাজে আমরা বাস করছি তা দেশের শ্রমিক কৃষক ও তাদের সহযোগী জনগণকে ভরণপোষণ করে না অথচ তারাই তো রাষ্ট্রকে শ্রম দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে—সে হবে মহত্তর সংস্কার। এই বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মে, এই বৈজ্ঞানিক সংস্কার অতি কাম্য সংস্কার। উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কই সামগ্রিকভাবে সমাজজীবনকে ও সমস্তপ্রকার মানবীয় সম্পর্কের চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করছে—সমাজ বিকাশের এই ধারা অনুধাবনের সংস্কার আধুনিক কালের জীবন্ত সংস্কার। এভাবে সুস্থ সংস্কৃতির আকাঙ্ক্ষা, গণতান্ত্রিক রীতিনীতিতে আস্থা, শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাস, শ্রেণী সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের অবশ্যম্ভাবী বিজয়লাভে প্রত্যয় নতুন পরিমাপের সংস্কার সৃষ্টি করবে।

এরকম আরও সব উন্নততর সংস্কারে সন্তান উদ্বুদ্ধ হতে পারলে ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সমাজটার নোংরা জমির ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারবে। সুন্দর, সচ্ছল, মর্যাদাপূর্ণ এক সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগ্রাম তারা জোরদার করতে পারবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে অধঃপতিত বুর্জোয়া সামন্ত রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে এই সব সংস্কারের, নৈতিকতার প্রত্যাশা কি বাস্তবিক? দুর্নীতিপরায়ণ হওয়া, কাজে ঢিলা দেওয়া, আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর হওয়া এসবই তো এই সমাজে স্বাভাবিক। কিন্তু সুন্দর সমাজ যারা কামনা করেন, যারা অগ্রসর মানুষ, যারা বলবেন—প্রাণপণে এই প্রতিকূল সমাজের জঞ্জাল দুহাতে সরাবেন, তাদের ক্ষেত্রে এই সংস্কার ও নৈতিকতা খুবই কাম্য এবং বাস্তবিক। চীন বিপ্লবের আগে মাও সে তুং চীনের পচাগলা সমাজটার জনগণকে, বিশেষ করে কমিউনিস্ট ও ক্যাডারদের নতুন সুন্দর সংস্কারে ও নৈতিকতায় পরিপুষ্ট হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন—"কোনো সময়েই এবং কোনো পরিস্থিতিতেই একজন কমিউনিস্টের পক্ষে তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রথমে স্থান দেওয়া উচিত নয়, বরং তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থকে জাতির ও জনসাধারণের

স্বার্থের অধীন রাখতে হবে। সেজন্য স্বার্থপরতা, কাজে ঢিলা দেওয়া, দুর্নীতিপরায়ণতা নয়, সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করা, গণকর্তব্যের প্রতি সর্বান্তকরণে আত্মনিয়োগ করা এবং নীরব ও কঠোর কাজই সম্মান লাভের যোগ্য।" [জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা]

অবশ্যই এই সব কাম্য সংস্কার ও মূল্যবোধ বর্তমান সমাজের জমিতেই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে। এইসব সংস্কারে সন্তানদের পরিপুষ্ট হতে সাহায্য করবে ভালো লেখক শিল্পীদের রচনা, দেশে দেশে মানুষের মহত্বের কাহিনী, বীরত্বের গাথা, আত্মবলিদানের গল্প, বিজ্ঞানের আলোকপাত, বিজ্ঞানদৃষ্টি, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের জয় পরাজয়ের ইতিহাস। দেশের কলে কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রাম, ক্ষেতে খামারে আফিসে আদালতে, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিদ্যালয়ে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক আন্দোলন এই সংস্কারের প্রতি উদাসীন থাকতে পারে না। নতুন সমাজ গড়ার লড়াইতে যাঁরাই বিজয়ী হয়েছেন, সে সব দেশ কখনও কুসংস্কারের প্রতি এবং নতুন কাম্য সংস্কার ও নৈতিকতার আকাঙ্ক্ষায় উদাসীন থাকে নি।

দৈত্য দানো ভূতের সঙ্গে যুদ্ধ

॥ ১ ॥

দৈত্যদানোভূতপ্রেত এসব শক্তিতে বিশ্বাস মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত ক'রে তোলে, পরাজিতের মনোভাব সৃষ্টি ক'রে মানুষকে দুর্বল ক'রে দেয়। পায়ে শিকল পরিয়ে মানুষকে ভালো কাজে উদ্যোগ নিতে পিছু টানে। সুতরাং ভূতপ্রেত দৈত্য দানোয় বিশ্বাসের চেয়ে লজ্জার ও সর্বনাশের বোধ হয় আর কিছু নেই। অথচ মজার হলো আদতে সমাজে এই সব শক্তির কোনো অস্তিত্বই নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে যে-শক্তির সামাজিক অস্তিত্ব নেই তার সম্পর্কে ধারণা হবে কী ক'রে? তার কাল্পনিক অস্তিত্ব আসবে কি ক'রে? উত্তরে বলবো, এদের একটা মিথ্যা অস্তিত্ব অবশ্য আছে। সেট কী রকম? যা কিছুকে অভিজ্ঞতায় আমরা হিংস্র ভয়ানক, মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর দেখি, তাকে বলি দানব, দৈত্য। যেমন দানবীয় অত্যাচার, আইন, দানবিক কাণ্ড, দৈত্যের মতো। যা কিছু অসুন্দর, বিশৃঙ্খল, অন্ধকার, ভীতিকর তাকে বলি ভূত প্রেত। যেমন ভূতুড়ে কাণ্ড, ভূতের মতো চেহারা, প্রেতনৃত্য ইত্যাদি। এভাবে মানুষের পক্ষে অকল্যাণকর শক্তি, ক্ষতিকর ও অসুন্দর শক্তিই দৈত্যদানোভূতপ্রেত। অজ্ঞতার সেই নিরুপায় অসহায় প্রাচীন যুগ-গুলিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যখন মানুষের সর্বনাশ করেছে, মানুষ যখন মার খেয়েছে ও হার মেনেছে—তাকে দানব বলেছে। অন্ধকারে মানুষ বড়ো অসহায় ছিল। তাকে ভূত বলেছে। সামাজিক দুর্ভোগ ও রোগশোকের সঙ্গে ঝুঝতে না পেরে প্রাণ দিয়েছে মানুষ। এইসব অনভিপ্রেত মৃত্যু ভূত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। সমাজের প্রধানদের সৃষ্ট দুর্ভোগে জ্বলে মরেছে মানুষ। বুক ফেটেছে, মুখ ফোটেনি। সেই দমিত ভীতি ও জ্বালাকে দানব রাক্ষস বলেছে। এইসব প্রবল মারকে বিজ্ঞানের আলোতে ব্যাখ্যা করতে না পেরে, মোকাবিলা করতে অপারগ হয়ে মানুষ এদের ভয়ানক ও পরাজয়াতীত শক্তিরূপেই বিশ্বাস ক'রে বসেছে। দুর্বল ও অজ্ঞ মানুষের এই বিশ্বাসকে কাজে লাগালো সমাজের চালাক লোকেরা। তারা দেখল মিথ্যা ও অনির্দেশ্যের শাসন প্রবলতর। রাজা, বাদশা, জমিদার, সমাজবিধান

প্রদানকর্তারা সাধারণ মানুষকে কব্জা করতে, বোকা বানাতে এবং নিজেদের শাসন, স্বার্থ, আধিপত্য পাকাপোক্ত করতে ভূতপ্রেতদানোদের একটা স্থায়ী অস্তিত্ব দিতে চাইল। এইসব শক্তিকে এরা কাজে লাগালো দু'ভাবে ঃ প্রথমত নিজেদের যতো দানবীয় ভৌতিক অত্যাচার, নীতি, বিধান, আইন সে সব আড়াল করার কৌশল হিসেবে এই নকল ভূতপ্রেতদানোদের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। দ্বিতীয়ত অস্ত্রধারী সৈনিক, লেঠেল, ঠ্যাঙাড়েদের মতোই এইসব অমঙ্গলের শক্তি দিয়ে মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখল। মহাভারতে এমন কাহিনী রয়েছে যেখানে রাজা নগরভর্তি প্রজাকে এক ভয়ানক রাক্ষসের হাতে তুলে দিয়ে রাজধানীতে বিলাসব্যাসনে কাল কাটিয়েছে। এইসব শক্তিতে বিশ্বাস যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় বাহিত হয়ে এসেছে। প্রতি যুগে এদের চেহারা বীভৎস হয়েছে, উচ্চতা বেড়েছে, দাঁত মুলোর মতো হয়েছে, চোখ অগ্নিময় হয়েছে। মানুষ ভয়ে কেঁপেছে। মা সন্তানকে ঘুম পাড়াতে এদের সব ডেকে এনেছে; রাজা বাদশা জমিদাররা এদের ডেকে এনেছে প্রজা শায়েস্তা করতে; পুরুত মোল্লা পাদরীরা প্রভুকে সাহায্য করতে, নিজেদের স্বার্থে এদের ডেকে এনেছে। কল্পনাশক্তিধর লেখকদের কলমে এইসব শক্তি দুর্ধর্ষ ভয়ানক হয়ে চারদিকে অবস্থান করেছে। এইভাবে এই সব নকল ভূতপ্রেতদৈত্যরাক্ষস এক আদিম মিথ্যার মতো, এক আদিম ভীতির মতো ছড়িয়ে পড়ল। আর তাদের ভয়ে মানবসন্তানরা যুগ যুগ ধরে মরতে লাগল।

॥ ২ ॥

এইসব শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে পারলে মানুষ বীর আখ্যা পান। এইসব বীরের আখ্যান লিখতে পারলে লেখকরা বড়ো লেখক হন। এ লড়াই বড়ো কঠিন। অনেকে এদের বিরুদ্ধে লড়তে নেমে এদের বিশ্বাস করে বসেন; এদের শক্তির প্রচারের এজেন্ট হয়ে পড়েন। সেরকম প্রচারের গ্রন্থও লেখেন। এ যেমন সেকালে ছিল, একালেও বিজ্ঞানের এমন অত্যুন্নত যুগেও রয়েছে। এ যুগে এমন বিজ্ঞানী ও বিদ্বান মানুষের নাম অনেকেরই জানা আছে যারা বিজ্ঞানের বিংশ শতকের শেষার্ধের আলোকোজ্জ্বল দ্বিপ্রহরে দাঁড়িয়ে ভূত-প্রেত নিয়ে গ্রন্থ লিখছেন। গ্রন্থ রচনায় কোনো দোষ নেই; কিন্তু সে গ্রন্থে এইসব শক্তিকে তাঁরা অবিশ্বাস করেছেন—এমনটা পাঠকের মনে হবে না।

বরং ভূতপ্রেতদানোর অস্তিত্বে ও শক্তিতে সন্তানদের বিশ্বাস তাঁরা উৎপাদন করে দিয়েছেন। সমাজ বিজ্ঞানী জেরাল্ড হকিন্স Chasing the Shadow (ছায়ার পিছু) নামে একখানা গ্রন্থ লিখে মার্কিনদের এক অর্থবান ভদ্রলোকের অনুদানরূপে ঘোষিত বহুলক্ষ ডলার লাভ করেছেন। বিদ্বান লেখক স্বামী অভেদানন্দর প্রেততত্ত্ব বিষয়ক বই পড়ে পাঠকের মনে ভূতপ্রেত মানুষের মরণোত্তর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাসের চেয়ে বিশ্বাসই সৃষ্টি হয়েছে। অমঙ্গলের শক্তিতে বিশ্বাস ও সংস্কার সৃষ্টিতেই আমাদের আপত্তি।

অথচ লড়াই করে ভূতপ্রেতদৈত্যদানোদের হারানো যায়, দমানো সম্ভব। আমাদের পূর্বপুরুষরা অধিকাংশ যেমন এসব শক্তিকে বিশ্বাস করতেন, ভয় করতেন, আবার তাদের মধ্যে এমনও অল্পসংখ্যক ছিলেন যাঁরা দৈত্যদানো-ভূতের ভয়ের শিকল পায়ে পরতে রাজি হননি ; এ শিকল কাটার জন্য তাঁরা লড়াই করেছেন ও দানো মারতে উৎসাহিত হয়ে, ভূতপ্রেতকে ঘৃণা করে এদের তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছেন। এঁরা প্রমাণ করেছেন ভূতপ্রেতদানো এইসব শক্তিকে ভয় পাবার কিছু নেই, রুখে দাঁড়ালে এরাই মানুষকে ভয় পায়। লোকসমাজে এইসব মানুষ বীরের আখ্যা পেয়েছেন। এঁদের পক্ষে দু'একজন মহৎ দার্শনিকও দাঁড়িয়েছেন। চার্বাক মানুষের মরণোত্তর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। আত্মার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান প্রসঙ্গে চার্বাক ব্যঙ্গ করে বলতেন—সূক্ষ্ম আত্মা ওপার থেকে এসে যদি পিণ্ড খেয়েই যেতে পারে, বিদেশে যারা থাকে এদেশে বসে তাঁদের উদ্দেশ্যে ভাত মেখে সাজিয়ে দিলে তাদেরও আহার হয়ে যায়। চীনের কনফুসিয়াস এইসব শক্তি ও দেবদেবতার অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশ করেছেন। এ সবই হলো প্রাচীনকালের দুর্বলতার মধ্যে জাতির শক্তির পরিচয়। এইসব বীরের বিজয়ের কাহিনী নিয়ে যে সব লেখক সেকালে কাহিনী রচনা করেছেন তারা শক্তিশালী শ্রদ্ধেয় লেখক প্রমাণিত হয়েছেন।

যেমন মহাভারতের ভীম ও বকরাক্ষসের কাহিনী। ভীমসেনের বকরাক্ষস-বধ মহাবীরের কাজ। বক ছিল রাক্ষস, অত্যাচারী, নরখাদক। রাজা থাকেন তার রাজধানীতে ; তারই রাজ্যাধীন একচক্রানগর রক্ষা করে বক রাক্ষস। দেশরক্ষার মূল্যস্বরূপ প্রতিদিন তার কাছে একজন লোক, প্রচুর অন্ন ও দুই মহিষ পাঠাতে হয় নগরবাসীকে। বক সেই মানুষ মহিষ আর অন্ন ভোজন

করে। আর্ত অসহায় নগরবাসীকে মহাবল বকের হাত থেকে রক্ষা করবে কে? সচ্ছল সুন্দর নগর শ্মশানে পরিণত হচ্ছে। রাক্ষস বধ করতে উৎসাহিত হলেন ভীমসেন। তুমুল যুদ্ধে বকরাক্ষসকে ভূমিতে ফেলে ভীমসেন নিষ্পিষ্ট করে বধ করলেন। বকের মৃত্যু চিৎকারে যখন অন্যান্য রাক্ষস বেরিয়ে এলো, ভীমসেন মহাগর্জন করে বললেন,—শোন্ রাক্ষসকুল, মানুষকে যদি কখনো হিংসা করিস্ তোদেরও এভাবে নিষ্পিষ্ট করে বধ করবো। তারপর ভীমসেন-বকরাক্ষসের মৃতদেহ নগরের দ্বার দেশে ফেলে দিয়ে প্রস্থান করলেন। রাক্ষস ভয়ে ভীত নগরবাসী বকের মৃতদেহ দেখে আশ্চর্য হলো; বলতে লাগল—দুর্ধর্ষ বকরাক্ষসকে বধ ক'রে কোন্ বীর আমাদের হিতসাধন করলেন? ভীমসেন আশ্রয় নিয়েছিলেন যে ব্রাহ্মণের গৃহে, তিনি বললেন,—এই মহাবীর এক মহাত্মা মানব সন্তান। নগরবাসী মনে জোর পেলো এই জেনে যে এমন অশুভ রাক্ষসকে মানুষ বধ করতে পারে। রামায়ণ মহাভারতে, ঠাকুরমা ঠাকুরদাদার ঝুলিতে দৈত্যদানো রাক্ষসের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধের ও বিজয়ের এমন অনেক কাহিনী রয়েছে। মানুষের মনে এই সব লড়াইয়ের কাহিনী সাহস জুগিয়েছে। সেকালের দুর্বলতার মধ্যে জাতির শক্তির পরিচয় এ-সব কাহিনী। এইসব বীরেরা লোকপ্রচলিত আদর্শের মূর্তি।

একালের এরকম ভূতবিজয়ী এক বীরের কাহিনী রচয়িতা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। তার নায়ক আমীর শেখ ভূতের সঙ্গে লড়াই ক'রে জয়ী হয়েছেন। ভূতের ভয়ে দেশের সন্তান যখন কাঁপে, ভূত নিয়ে কিছু বিদ্বান মানুষ ও লেখক মানুষ যখন মাথা ঘামিয়ে ভূতকে বিশ্বাস্য করে তুলতে চান, আমীর শেখ তখন ভূতকে তাড়িয়ে ধরে ঘানিতে পিষে এক শিশি তেল বার করে নিয়েছেন। বড়ো সুন্দর এ কাহিনী। ভূতেরা যে সবই কাগুজে ভূত, সাহস করে ভূতের দিকে এগুতে পারলে মানুষের ভয়ে ভূতেরা যে কাঁপে, পথ ছেড়ে লুকিয়ে পড়ে—এ কাহিনীতে সে কথা রয়েছে। মনে সাহস জোগানোর সাহিত্য রচনা করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ। এ কাহিনী এ কালের দুর্বলতার মধ্যে জাতির শক্তির পরিচায়ক। এক ভূত আমীরের স্ত্রীকে লুটে নিয়ে গেছে। স্ত্রীকে যদি কেউ হরণ করে, হরণকারীকে সাজা দিয়ে স্ত্রীকে উদ্ধার করতে যে স্বামী ঝুঁকি নেবে না সে তো দুর্বল; স্বামী হবার

অযোগ্য। একই কথা স্ত্রীর ক্ষেত্রেও সত্য। আমীর শেখ সাহসী, সবল। তিনি স্ত্রী হরণকারী ভূতের খোঁজে বার হলেন এবং শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিবলে, সাহসে, চতুরতায় লুল্লু নামক ভূতটাকে জব্দ করে স্ত্রীকে উদ্ধার করলেন। ভূতকে জব্দ করতে আমীর শেখের স্ত্রীর তীক্ষ্নতা ও বুদ্ধিবল স্বামীকে কীই না সাহায্য করেছে। স্বামী স্ত্রী ভূতেরই কাঁধে চেপে দিল্লি ফিরে এলেন।

সব দেশেই ভূত বিশ্বাসের দুর্বলতার মধ্যে ভূত অবিশ্বাসের বীরত্বের কাহিনী রয়েছে। চীন দেশে এমন কিছু বুদ্ধিমান বীরের কাহিনী আছে যে সব বীর ভূতের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে, ভূতকে জব্দ করে দেখিয়েছেন বাস্তবে ভূতকে মানুষের ভয় পাবার কিছুই নেই। 'Stories about not being afraid of ghosts'—এ রকম এক চমৎকার ভূতে অবিশ্বাসী নির্ভীক বীরের গল্পগ্রন্থ। এক বীর সৈনিক তৌ-পি-য়িকে বড়ো রাস্তার এক ভয়ানক ভূতের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। ভূতটা ছিল উচ্চতায় বিশ ফুট। বড়ো রাস্তায় সে ঘোরাফেরা করতো। অন্ধকারে, জলঝড়ে পথচারী রাস্তায় বেরুলে সে তাদের ভয় দেখিয়ে মেরে ফেলত। অগুণতি পথচারী ওর হাতে প্রাণ হারিয়েছে। গ্রামের মানুষকে এই দুর্বৃত্ত ভূতের হাত থেকে রক্ষা করতে তৌ-পি-য়ি উৎসাহিত হলেন। ভূতের আস্তানা খুঁজে বার করতে তিনি তীর ধনুক হাতে বেরিয়ে পড়লেন। দূর থেকে দেখলেন বীভৎস ভূতটা মানুষ শিকারে বেরিয়েছে। তৌ-পি ধনুকে তীর যোজনা করে হুঙ্কার দিয়ে ভূতকে তাড়া করতে ভূতটা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগল। তৌ-পি পশ্চাদ্ধাবন করে পর পর তিন বাণে ভূতটাকে বিদ্ধ ক'রে হত্যা করলেন। সেই থেকে বড়ো রাস্তা ভীতিমুক্ত হলো। মানুষ স্বস্তি পেলো। তৌ-পি হলেন বীর সাহসী পুরুষ। এ হলো সপ্তম শতকের চীনের ভূতপ্রেতদানোর দুর্বলতার মধ্যে জাতীয় শক্তির পরিচায়ক বীরের কাহিনী।

এসব কাহিনী প্রমাণ করে মানুষ একটু সাহসী হলেই উপলব্ধি করবে ভূতপ্রেতদানোকে ভয় করে দুর্বল হবার কিছুই নেই।

॥ ৩ ॥

সমাজগতভাবে, রাজনীতিগতভাবে মানুষ আরেকটু সচেতন হলেই

পরিষ্কার বুঝতে পারবে ভূতপ্রেতদানো বলে কিছু না থাকলেও এই পৃথিবীতে এমন অনেক শক্তি আছে যেসব ভূতপ্রেতদানোর মতোই। অবশ্য এদেরও ভয় করবার কিছু নেই। আসল ভূতপ্রেতদানোদের অস্তিত্ব উদ্ঘাটিত হয়েছে একালে। এদের সামাজিক অস্তিত্বই রয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ এইসব শক্তিকে দেখেছে। এদের কণ্ঠস্বর ধরে রাখা হয়েছে, নানা ভঙ্গীর ছবি ছাপানো হয়েছে, এদের অনেককে ধরে এনে বিচারালয়ে বিচার করা হয়েছে। কিছু লেখক, কিছু বিজ্ঞানী বিদ্বান মানুষ এইসব প্রকৃত দৈত্যদানোভূতদের আড়াল করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু একালের সমাজগতভাবে, রাজনীতিগতভাবে সচেতন ও সংঘবদ্ধ বীর মানুষেরা আড়াল ঘুচিয়ে, ছদ্মবেশী ভূতপ্রেতদানোকে উড়িয়ে হঠিয়ে দিয়ে প্রকৃত এসব অমঙ্গলের শক্তিকে টেনে এনে সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

এ রকম এক দানোর দানবিক অত্যাচারের ঘটনা বলছি। অতি নিকট অতীতে বছর চল্লিশ আগে, জার্মানি দেশে 'মেনগেলে' নামে এক দানো ছিল। বকরাক্ষসের চেয়ে, বড়ো রাস্তার ভূতের চেয়েও সে ছিল হিংস্র। শিশুর উষ্ণরক্তে মেনগেলের তৃষ্ণা। শিশুপীড়নে তার অত্যন্ত আনন্দ। একদিন কয়েকটি শিশুকে ধরে সে উড়িয়ে নিয়ে যায় অসউইসিম্ নামে এক স্থানে এক শিবিরে। সেখানে শিশুদের হাতের তালুতে আগুনে পুড়িয়ে উল্কি দিয়ে নম্বর লিখে দেয়। ঘোড়ার বদলে গাড়িতে শিশুদের যুতে দিয়ে কয়লাপাথর টানায়। এতেও মেনগেলের মজার তৃপ্তি হয় না। এই দানো শিশুদের কাটাছেঁড়া ক'রে নানা রকম গবেষণার কাজ চালায়। শিশুদের শরীর থেকে রক্ত টেনে নিয়ে বিভিন্ন রাসায়নিক জিনিসে ঢুকিয়ে দেয়। শিশুরা যখন আধমরা হয়, তাদের সেই অবস্থায় কবর দিতে পাঠিয়ে দেয়। বকরাক্ষসের সঙ্গে বা বড়ো রাস্তার ভূতের সঙ্গে মেনগেলে দানোর পার্থক্য কেবল হত্যা করার ভঙ্গীতে। এই মেনগেলে ছিল এক নাৎসি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পোল্যাণ্ডের অসউইসিম্ মৃত্যু শিবিরে এই নাৎসি দানোটা শিশুদের এইভাবে হত্যা করেছে। একালের বিশালাকার দৈত্য-দানোভূত হলো এই নাৎসিবাদ—ফ্যাসিবাদ—সাম্রাজ্যবাদ—এবং এ রকম সব অমঙ্গলের শক্তি এবং এদের নায়করা।

মুসলিনী, হিটলারকে কে না দানব বলবে? বকরাক্ষস একচক্রানগরকে

ছারখার করেছিল। হিটলার তার ফ্যাসিবাদ দিয়ে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করেছিল তাতে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকার চল্লিশটি দেশে হাহাকার উঠেছিল। পাঁচ কোটি মানুষ নিহত হয়েছিল। এক সোভিয়েট রাশিয়ায় দু কোটি মানুষ নিহত হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার হাজার হাজার গ্রাম শহর নাজীরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয়। জার্মানিতে ৬৫ লক্ষ মানুষ নিহত হয়, চীন দেশে এক কোটি মানুষ, জাপানে নিহত হয় ২৩ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ, গ্রেট বৃটেনে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার, ৬ লক্ষ মানুষ নিহত হয় ফ্রান্সে, পোল্যাণ্ডে ২০ লক্ষ, ইতালিতে ৫ লক্ষ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিহত হয় ৩ লক্ষ ২ হাজার, ভারতবর্ষে ৩৭ হাজার নিহত হয়। মৃত্যু শিবিরে ঢুকিয়ে গ্যাসচেম্বারে পুরে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে হিটলার। একমাত্র অসউইসিম্ মৃত্যুশিবিরে প্রতিদিন ৬ হাজার মানুষকে গ্যাস দিয়ে পুড়িয়ে মারা হতো। মানুষের পোড়া ছাই বস্তা ভরে ক্ষেতের সার করার জন্য পাঠানো হতো। মৃতের মাথার চুল কেটে নিয়ে তোষক বানিয়ে হিটলারের নাজীবাহিনী ব্যবহার করতো। মৃতের গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নাজী রক্ষীরা নানা ব্যবহার্য জিনিস তৈরি করতো। এতেও হিটলারের তৃপ্তি হয় নি। মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে যাঁরাই অমঙ্গলের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, হিটলার তাঁদের হত্যা করার এক বীভৎস যড়যন্ত্র করে। বৃটেন আক্রমণ ও অভিযানের জন্য হিটলার যে পরিকল্পনা করে তাতে অধিকৃত বৃটেনে গেস্টাপোর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার কথা ছিল এবং এর উদ্দেশ্য ছিল বৃটেনের বীর সন্তানদের নিশ্চিহ্ন করা। ২৩০০ জনের নামের একটা তালিকাও প্রস্তুত করেছিল হিটলার। হত্যা করার সে-তালিকায় নাম ছিল চার্চিলের, এইচ জি ওয়েলসের, ভার্জিনিয়া উলফের, আলডুস হাকস্লির, রাসেলের। বকরাক্ষস, বা বড়ো রাস্তার ভূতের চেয়ে সহস্রগুণ হিংস্র এই ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, ডাক দিয়ে যাই / দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে / প্রস্তুত হ'তেছে ঘরে ঘরে / —তখন এই সব বিশালাকার প্রকৃত দানবের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য যাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন, সেই বীর মানুষদেরই উৎসাহিত করেন।

সেকালে ভীমের মতো, তৌ-পি-য়ি-র মতো এই দানবকে একালে নিষ্পিষ্ট ক'রে বধ করতে উৎসাহিত হলেন বীর স্তালিন। তবে লোক-

প্রচলিত আদর্শের মূর্তি ঐ সব বীর নায়কদের মতো স্তালিন এককভাবে ফ্যাসিবাদের দানবকে বধ করেন নি। দেশের মানুষকে সংগঠিত করে, বিশ্বের ভালো মানুষের সমর্থন নিয়ে এবং বন্ধু দেশের সাহায্য নিয়ে স্তালিন এই দানবকে দমন করলেন। ফ্যাসিস্ট দানব হিটলার আত্মহত্যা করল। ভীমসেন যেমন বকরাক্ষসকে নিষ্পিষ্ট করে বধ করে তার রাক্ষস সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বললেন,—মানুষকে হিংসা করলে তোদেরও মরতে হবে—সোভিয়েত রাশিয়া সেরকম হুংকারে বললেন—মানুষের সচ্ছল সুন্দর শান্তির সমাজ ও সংসার ধ্বংস করতে এলে মানুষের হাতে মরতে হবে। সোভিয়েতের এই বিজয় দুর্বলতার মধ্যে মানুষের শক্তির ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের অমিত শক্তির পরিচয়।

কিন্তু দৈত্যদানোভূত বারে বারে বীর মানুষের হাতে পরাজিত হলেও এইসব অমঙ্গলের শক্তির উদ্ভবের কারণ দূর না হলে এরা নতুন নতুন রূপে দেখা দেবেই। সম্প্রতি এই ফ্যাসিস্ট দানব যুদ্ধবাজ মহাহিংস্র সাম্রাজ্যবাদের বেশ ধরে এসেছে। দানবকুলের নেতৃত্ব দিচ্ছে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ। তার মিত্র সাকরেদরা বিশ্বের দুয়ারে দাঁড়িয়ে হুংকার দিচ্ছে—দুনিয়াটার ওপর আমাদের প্রভুত্ব করতে দাও, নয়তো দুনিয়া ছারখার করবো। তবে ভরসা হলো সে কালের ভীম, তো-পি-য়ি, আমীর শেখের মতো বীরেরা নতুন যুগে লক্ষ স্তালিন হয়ে নতুন রূপে নতুন শক্তিতে এই দানব-দমনের বিশ্বজোড়া শক্তির অভ্রান্ত পরিচয় দিচ্ছেন। লেখকগণ এই বীরত্বের ও অমঙ্গলবিজয়ী শক্তির কাহিনী রচনা ক'রে মানুষকে উৎসাহিত করছেন।

॥ ৪ ॥

এইসব বিশালাকার দৈত্যদানোর পাশে দেশে দেশে দেশী ভূতদানোও রয়েছে। এরা সব প্রতিক্রিয়ার ভূত, সাম্প্রদায়িকতা প্রাদেশিকতার ভূত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মানবসৃষ্ট দুর্ভোগের ভূত, বাধাবিপত্তির প্রেত। আমাদের ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার দুটি যমজ ভূত বড়ো উৎপাত করছে। এই দুই ভূতের জন্ম ভারত যাঁরা শাসন করছেন তাদেরই সৃষ্ট প্রভেদের কূপে, বঞ্চনা প্রতারণার কূপে, প্রদেশে প্রদেশে আন্তরিক পরিচয়ের

অভাব সৃষ্টির কূপে। সাম্প্রদায়িকতার ভূতটা এই অন্ধকূপ থেকে ধর্মাভিমানের ঘাড়ে চেপে উঠে আসে। আর প্রাদেশিকতার ভূতটা ঐ কূপ থেকেই জাতিগত বঞ্চনাবোধের, অবিচারের ধারণার ও জাত্যভিমানের কাঁধে চেপে উঠে আসে। কূপের বাঁধানো চাতালেই অপেক্ষা করে থাকে দেশী বিদেশী স্বার্থান্বেষী মহাজনরা। ভূত দুটো উঠবার সঙ্গে সঙ্গে এরা তাদের সুদে খাটিয়ে কামিয়ে নেয়। আর আমরা, জনপদবাসী বোকারা, স্থান করে দিচ্ছি এইসব ভূতদানোর তাণ্ডবের। ভারত যারা শাসন করছেন সেই শ্রেণী ও দল কখনও এইসব শক্তিকে প্রশ্রয় দেন, কখনও এদের কাজে লাগান সংকীর্ণ স্বার্থে। কখনও কখনও এইসব অমঙ্গলের শক্তির প্রতি এদের মনোভাব আপোসের। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এইসব প্রেতশক্তি ভারতবাসীকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

তবে এদেরও ভয় করার কিছু নেই। মানুষ যদি ঐক্যশক্তিতে আস্থা রাখে, সত্যসন্ধানে উদ্যোগী হয় এবং মানুষ যদি বিপত্তির সমাজতান্ত্রিক সমাধানে বিশ্বাস রাখে, দেখবে—এসব ভূতপ্রেতদানোকে ভয় করার কিছুই নেই। চীন দেশে যখন মুক্তির লড়াই চলছিল, সেই সময়ে ছদ্মবেশী ঐসব ভূতপ্রেতদানোর বিশ্বাস প্রবল হয়ে উঠেছিল। নকল ও আসল এইসব অশুভ শক্তির সঙ্গে লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়ে মাও সে তুং বলেছিলেন— কাকে কাকে তোমাদের ভয় করা উচিত নয়? স্বর্গকে ভয় কোরো না, মৃত্যুকে ভয় কোরো না, আমলাদের ভয় থেকে মুক্ত থাকো, যুদ্ধবাজদের ভয় থেকে মুক্ত থাকো, পুঁজিবাদীদের ভয় থেকে মুক্ত থাকো,—ভূতপ্রেত-দৈত্যদানোদের ভয় কোরো না। মাও সে তুং-এর এই আহ্বান সমগ্র চীনদেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল।

সকল দেশেই যাঁরাই চাইবেন একটা সুন্দর, সচ্ছল, মর্যাদাপূর্ণ শান্তির সমাজ ও সংসার গড়ে তুলতে, তাদের সকলকে এইসব ভয় ও সংস্কার থেকে মুক্ত থাকতেই হবে। মুক্ত হতে পারলে আমাদের এই সুন্দর ও প্রিয় পৃথিবীতে এখনও যেসব দৈত্যদানোভূত মানুষকে যন্ত্রণা দিচ্ছে, শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে তাদের ভূমিতে ফেলে নিষ্পিষ্ট করে বধ করা যাবেই।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও আমরা

আত্মানং বিদ্ধি—নিজেকে জানো; এ-যুগে নিজেকে জানার সূত্র হল নিজের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে জানা। সেটা জানার পথ হচ্ছে, যে-সমাজটায় বাস করছি, দেখছি সেটা উৎপাদন সম্পর্কে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, তার কোন্ শ্রেণীতে অবস্থান, জানা। জানতে পারলে সমাজের গতিধারাটাকে বুঝতে পারা যাবে এবং সে গতিস্রোতে ভবিষ্যতে কোন কূলে গিয়ে ঠেকব, ঠিকানা মিলবে। আমরা যারা আফিস-আদালতে, সরকারী-বেসরকারী দপ্তরে কর্মচারী, আমরা যারা স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছোটখাটো ব্যবসায়ী, দোকানের মালিক, ছোট হস্তশিল্প কারখানার মালিক ইত্যাদি, কোন্ শ্রেণীভুক্ত আমরা? পুঁজিদার-জমিদার শ্রেণীভুক্ত তো নই-ই। যদি মাসিক বা বাৎসরিক আয় দিয়ে বিচার করি, একজন মাঝারি কৃষকের চেয়ে আমাদের অনেকের আয় কম হতে পারে। অথচ আমরা শ্রমিক বা কৃষকশ্রেণীতে পড়ি না। অর্থাৎ আয় দিয়ে শ্রেণী বিচার হবে না। সংসারে আমাদের খরচ বাড়ছে, বেতন পর্যাপ্ত নয়, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ করের চাপ বাড়ছে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ বাড়ছে, বাড়িভাড়া বাড়ছে, দুবেলা পরিশ্রম করে উপার্জনেও দেখছি দারুণ দুর্দশা ও গভীর দুর্ভোগ বটের আটার মত লেপটে আছে। বিধ্বস্ত জীবনের এই দৈনন্দিন ইতিকথা নিয়ে আমরা খুঁজছি শ্রেণীগত জন্মরহস্য।

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মনীষী মার্কস্-এঙ্গেলস্ আমাদের জন্মরহস্য-কথা শোনালেন,—আমরা প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মাঝখানে। আমরাই মধ্যবিত্ত পেটিবুর্জোয়া শ্রেণী। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে তাঁরা লিখলেন, "আধুনিক সভ্যতা যে সব দেশে সম্পূর্ণ বিকশিত সেখানে আবার পেটিবুর্জোয়ার নতুন এক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মাঝখানে এরা দোলায়িত।" আমরা ত্রিশঙ্কু। এই ত্রিশঙ্কুর স্রষ্টা কে? মনীষীরা দেখালেন, শিল্প বিপ্লবের ফলে বুর্জোয়াশ্রেণী আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীকেও সৃষ্টি করেছে, এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও সৃষ্টি

করেছে। তবে শ্রমিকশ্রেণী জন্মেই স্রষ্টার বিরুদ্ধে হাতুড়ী বাগিয়ে ধরল, তার সমাধি খনকের ভূমিকা নিল। আর মধ্যবিত্ত শ্রেণী 'বুর্জোয়াদের একটা আনুষঙ্গিক অংশ হিসাবে বার বার নতুন হয়ে উঠতে লাগল'। আনুষঙ্গিক এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীটাকে বুর্জোয়ারা তাদেরই শ্রেণীস্বার্থের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে বিশ্বজুড়ে কাজে লাগিয়ে এসেছে। বুর্জোয়াদের যখন প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল, এই আনুষঙ্গিক অংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীটাকে তারা দায়িত্ব দিয়েছিল প্রগতির বাণী প্রচারের। মধ্যবিত্ত শ্রেণীটাও শিল্প-সাহিত্যে-দর্শনে, অর্থনীতি-রাজনীতি-ধর্মনীতিতে প্রগতির রামধনুর রঙ বাহার বিশ্বময় তুলে ধরে সমাজ অগ্রগতিতে সাহায্য করেছিল। বর্তমান বিশ্বে বুর্জোয়াশ্রেণী যখন প্রগতিশীল ভূমিকা পালনে ব্যর্থ অথচ অস্তিত্ব-রক্ষায় লড়ছে, তখনও এই আনুষঙ্গিক অংশই বার বার নতুন হয়ে উঠবার সূত্রেই ক্ষয়িষ্ণু ক্ষমতার চমক, ঠাঁট, ছলনা, বিভ্রান্তি, বিকৃতি প্রচার করে বুর্জোয়াদের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনই সাধন করে চলেছে।

বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মাঝখানে এই অবস্থান আমাদের সমস্ত চরিত্রটারই রূপ ও স্বরূপ, গতি ও ধর্ম তৈরি করে দিয়েছে। অবস্থানের মধ্যবর্তিতার জন্যই আমরা মধ্যবিত্তরা জীবনদৃষ্টিতে দোলাচল, চিন্তায় দোলাচল, চরিত্রে দোলাচল। আমরা উঁচু শ্রেণীটাকে আঁকড়ে ধরতে যাই। এই আঁকড়ে ধরা আমাদের চরিত্রের একটা দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য। আমাদের অর্থ নেই অহংকার আছে; গতর নেই বিদ্যাবুদ্ধি আছে; উপায় নেই আশালতাকে মাচা বেঁধে ওপরে লতিয়ে দেই। ভাবি, ওপরে বেয়ে যদি ভাগ্যটা ফেরাতে পারি, যদি মালক্ষ্মীর কৃপা হয়, যেনতেন করে বুর্জোয়া-শ্রেণীর মধ্যে যদি ঢুকে পড়তে পারি, ওরা যদি কৃপা করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য চাকরির ক্ষেত্রে উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে সেই চেষ্টাই করি, তোষামোদ করি, জুয়াচুরিও করি কিছু। এর থেকেই আরেকটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য 'সুবিধাবাদ' এসেছে মধ্যবিত্ত চরিত্রে। এই সুবিধাবাদই জন্ম দিয়েছে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে এবং স্বার্থমগ্নতাকে। আমাদের ভয় আছে প্রলেতারিয়েতের মধ্যে যদি গিয়ে পড়ি, নিজেদের বৈশিষ্ট্য আর থাকবে না। দৈনন্দিন জীবনে প্রতিযোগিতার চাপে সমাজের অর্থনৈতিক অমোঘ গতিধারায়, বুর্জোয়া জমিদার শোষণের দুর্ভোগ আর দুর্দশার পেষণে নীচের

দিকে প্রলেতারিয়েতের মধ্যে যে ক্রমাগত নিক্ষিপ্ত হচ্ছি। এর থেকেই বুর্জোয়াশ্রেণীর কাউকে দেখলে বিনয়ে বিগলিত হই, নিজের আগোচরে হাতের দুই চেটো এক হয়ে কচলা-কচলি করতে থাকে, সচেতন হলে সরিয়ে ফেলি, কিন্তু বড় বেগ পেয়ে ঠেকাতে হয়। চঞ্চল হে আমি নয়নকৃপার পিয়াসী। যখন কৃপালাভে সুবিধা হলো না, তিনি আমার প্রতি নজর দিলেন না, অনাদর দেখা গেল, তখন যতখানি বিনয়ী হয়েছিলাম, ততখানি উদ্ধত হয়ে পড়ি, গালি পাড়ি, অবশ্য মুখোমুখি নয়, ভয় আছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আবার বিভিন্ন লোক। অর্থ আয়ের, উদ্বৃত্ত ভোগের ও সংসার যাত্রার তারতম্যে দোলনের তারতম্য ঘটে। এই আশা, এই ভয়, আর ইতিহাসের এই অবশ্যম্ভাবী গতিধারা দেখে আমরা মধ্যবিত্তরা নিরন্তর ভারসাম্য খুঁজছি, ক্রমাগতই দুলছি। এই ভারসাম্য সন্ধান মধ্যবিত্ত চরিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। এর থেকে জার্মান, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, রুশ, চীন ইত্যাদি দেশে দেশে সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিপ্লবের ইতিহাসে দেখা গেছে বিপদের সংকেত যতদিন মধ্যবিত্তরা না দেখেন, তারা বড় বড় কথা বলেন, বিপ্লবীবুলিতে মেতে ওঠেন, 'অপরূপ মনোহারী মাতাল করা ধ্বনি, কিন্তু তলে তার জমি নেই।' আর যেই বিপদের সম্ভাবনা আসে, লড়াই লাগে, ঘাবড়ে যান, চুপসে যান, আপোসকামী হয়ে ওঠেন। তারা গুরুগম্ভীর নিরপেক্ষ হয়ে পড়েন। এমন কি কেতাবী বিপ্লবী হয়ে ওঠেন। লড়াইয়ে যখন বুর্জোয়াদের জয় হতে থাকে বুর্জোয়াদের দিকে সরে পড়েন। আর যখন প্রলেতারিয়েত জয়ী হতে থাকেন তখন তাদের দিকে সরে পড়েন। অবস্থানের কারণেই মধ্যবিত্তরা দুমুখো এঞ্জিন গাড়ির মতো। মার্কসের বিশ্লেষণে, তারা হচ্ছেন একধারে বুর্জোয়া ও জনসাধারণের লোক।

তথাপি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে বেশ বড় ভালো অংশ আছেন যারা নিজের থেকেই প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে যোগ দেন। প্রলেতারিয়েতের দুর্দশা, শোষণ, লড়াই দেখে এবং নিজেদের পরিণতি জেনে ভবিষ্যৎ স্বার্থে মধ্যবিত্ত দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন এবং তাদের সংগ্রামে ও বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মধ্যবিত্তশ্রেণীর এই স্বভাবধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত-শ্রেণীটাকে দেখা যাক্।

মার্কস্ তাঁর 'ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল' রচনায় লিখেছেন, "কলকাতায় ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে অনিচ্ছাভরে ও কার্পণ্য সহকারে শিক্ষিত ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে নতুন একটি শ্রেণী গড়ে উঠছে যারা শাসন পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত।" মার্কস্ যে নতুন শ্রেণীটির 'গড়েওঠা' দেখেছেন; সেই শ্রেণীটাই আমাদের দেশের মধ্যবিত্তশ্রেণী। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্মই হয় বুর্জোয়াশ্রেণীর আনুষঙ্গিক অংশ হিসেবে, তার প্রত্যক্ষ প্রয়োজন সাধনে। এই জন্যই বুর্জোয়াশ্রেণীর তত্ত্বাবধান সেখানে সজাগ প্রহরারত। আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীটিও বৃটিশ বুর্জোয়ার আনুষঙ্গিক অংশ হিসেবে তাদের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছে। এরকম একটা শ্রেণীর প্রত্যক্ষ প্রয়োজন ইংরেজের হলো কেন?

আমাদের দেশ জয় করে ইংরেজ প্রথমে নজর দিল—একটা কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক শাসন দাঁড় করাতে হবে। শক-হূণ-পাঠান-মোঘল যা পারে নি, ইংরেজ তাতে সফল হল। ১৭৬৫তে দেওয়ানী লাভ করল, আর ১৭৯৩-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করল। পরে তা জমিদারী প্রথার রূপ নিল। জমি নাও, জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা নাও, আমাদের খাজনা দাও। রেণ্ট ধার্য হল বিলাতী কায়দায়। কর্ণওয়ালিশ বললেন, ইংলণ্ডের কায়দায় একদল ভারতীয় ভূস্বামী গঠিত হোক। এরা ইংরেজের প্রতি অনুগত হবে, ইংরেজের বশম্বদ থাকবে। শাসনকার্যের বিঘ্নতায়, প্রজাদের অসন্তোষে, বিদ্রোহে, বিপ্লবে এরা শাসকশ্রেণীকে সাহায্য করবে। সুতরাং ইংরেজের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে, তাদের তত্ত্বাবধানে সামন্তাশ্রয়ী বা ভৌমিক মধ্যস্বত্ব ভোগী মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে উঠল। এরা ভূমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, ভূমিতে তাদের স্বার্থ, ভূমি থেকে পাওয়া আয় তারা ভোগ করতেন। কিন্তু এরা সামাজিক ভিত্তিহীন, এরা ভুঁইফোড়, এরা বৃটিশ বুর্জোয়ার আনুষঙ্গিক অংশ।

কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গঠন তখনও সম্পূর্ণ হল না। ইংরেজ যখন ভূমিতে এই নীতি নিল, তারই আনুষঙ্গিক হয়ে এল আদালত, ব্যবসা-

বাণিজ্য, হাউস, দপ্তর ইত্যাদি। এই ক্রমবর্ধমান শাসনকার্য চালাবার জন্য ইংরেজ শাসক একদল দেশীয় লোককে উপযোগী করে তুলবার আশু প্রয়োজন বোধ করল। বেণ্টিঙ বললেন, উপযোগিতার বড় কথা হল তাদের ইংরেজের স্নেহান্বিত হতে হবে। ১৮৩৭-এ বেণ্টিঙ হাউস অব কমন্স-এ এই আনুষঙ্গিক বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর পক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন। সঙ্গে এও বললেন এই নবসৃজিত শ্রেণীটির উপযোগিতার বড় কথা হবে, এটি থাকবে **ইংরেজ শাসকের স্নেহান্বিত**। স্নেহান্বিত কথাটা বেণ্টিঙেরই চয়ন। ১৮৪২-এ ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টকের অধ্যক্ষদের ত্রৈমাসিক বিবরণীতে এই আনুষঙ্গিক অংশটির জন্য বেণ্টিঙের কণ্ঠস্বর আরও জোরদার হলো। এবং সেখানেও স্নেহান্বিত কথাটা রইল। স্নেহান্বিত শ্রেণীটির গঠনে মেকলের উচ্চকণ্ঠ সমর্থন ছিল। সমর্থন ছিল জর্জ টমসন, ক্যামবল প্রমুখের। শিক্ষার ওপর এ্যাডাম সাহেবের রিপোর্টে মেকলে যে মুখবন্ধ লিখলেন সেখানে তিনি পরিষ্কার করে বললেন, ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে এমন একশ্রেণীর মানুষ তৈরি করা হোক যারা কেবলমাত্র গায়ের রঙে ও জন্মসূত্রে হবে ভারতীয় কিন্তু রুচিতে, মতামতে, নীতিবোধে ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ—"a class of persons Indian in colour and blood but English in taste, in opinions, in morals and in intellect." এই প্রয়োজনীয় শ্রেণীটিকে শিক্ষা দেবার ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণী সর্বসম্মত হতে পারে নি। একাংশ ভয় পেল দেশীয়রা শিক্ষা পেলে ভারতবর্ষে উপনিবেশটা হারাতে হতে পারে; আমেরিকায় উপনিবেশটা হারিয়ে তারা আতঙ্কিত হয়েছিল। কিন্তু বেণ্টিঙ মেকলে প্রমুখ অংশ সফল হলেন। তারা দেখালেন ইংরেজের ঔপনিবেশিক স্বার্থ ও পূর্ব ভূ-ভাগে বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রয়োজনেই এই আনুষঙ্গিক শ্রেণীটাকে উপযোগী করে তুলতে হবে। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যেহেতু লক্ষ্য ছিল না, লক্ষ্য ছিল শাসনকার্য পরিচালনায় উপযোগী করে তোলা, সেহেতু যতটুকু জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখল তা শেখাতেও শাসক শ্রেণীর 'অনিচ্ছা ও কার্পণ্য' ছিলই। মার্কস্ অভ্রান্ত বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে তা উল্লেখ করেছেন।

এই উপযোগী দেশীয় অংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গঠন সম্পূর্ণ করল।

ভৌমিক স্বার্থে জড়িত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের এবং তাদের সন্তানসন্ততিকে 'উপযোগী' করে তুলতে উঠে পড়ে লাগলো। বর্তমান স্বার্থ নয়, ভবিষ্যৎ স্বার্থরক্ষার জন্য যে উপযোগী হয়ে উঠতে হবে এবং তাতে করেই যে সামাজিক প্রতিপত্তি সম্ভব হবে, একথাটা তারা ব্যবহারিক জ্ঞাননেত্রে ও ভবিষ্যতের স্বার্থবুদ্ধিতে উপলব্ধি করল। 'নীলদর্পণ' নাটকে ভৌমিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই স্বার্থবুদ্ধি চমৎকার অঙ্কিত হয়েছে। ভৌমিক নবীনমাধব ভাই বিন্দুমাধবকে ভবিষ্যতে সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য 'উপযোগী' করতে কলকাতায় রেখে ইংরাজী পড়াচ্ছেন। বিন্দুর ইংরাজী বিদ্যার গৌরব লোকের কাছে করছেন এবং তার 'কর্ম হওয়া অপেক্ষা' করছেন।

এইভাবে আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরেজের আনুষঙ্গিক অংশ হিসেবেই নতুন হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রূপ-স্বরূপ, গতি ও প্রকৃতি তাদের মধ্যে ফুটে উঠল। মধ্যবিত্তের ভবিষ্যৎ স্বার্থ তাদের জনসাধারণ থেকে দূরে ঠেলে দিল। এই সামাজিক ব্যবধান ততই প্রবল হল, যত তারা শাসক শ্রেণীকে আঁকড়ে ধরতে চাইল, তাদের কৃপাপ্রার্থী ও স্বার্থ সাধনোন্মুখ হলো। মাটির প্রদীপটাকে গলা টিপে দিয়ে কেরোসিন শিখাটা চাঁদের দিকে হাত বাড়াল। আত্মকেন্দ্রিকতা, অহংবোধ, স্বার্থান্বেষণের সিঁড়ি বেয়ে তারা বিরাট জনসমষ্টির জনপদ থেকে দূরে সরে রইল।

১৮৫৭, সিপাহী বিদ্রোহ এ-দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরিত্রধর্মের এক নির্ণায়ক ঘটনা। ১৮৫৭ পর্যন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীটার লক্ষ্য ছিল শাসকদের বিরাগভাজন না হওয়া। একদিকে যেমন পশ্চিমমুখী জানালা পথে গণতন্ত্র, মানবতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ইত্যাদি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রগতিশীল ভূমিকা তাদের মুগ্ধ করেছিল এবং তারা দেশে এ-সব গুণের প্রচার ও প্রসার চাইলেন, আরেকদিকে শাসক ইংরেজের দাক্ষিণ্যলাভে ভবিষ্যৎ তৈরী তাদের প্রলুব্ধ করেছিল। সুতরাং ইংরেজ শাসনের উৎখাত হোক, তারা চান নি। ১৮৪৩, ২০ এপ্রিল সমাজ সংস্কারক জর্জ টমসন এবং বাবু রামচন্দ্র মিত্র, বাবু মধুসূদন সেন, বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্তী, বাবু চন্দ্রশেখর দেব, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু শ্যামাচরণ সেন, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র,

বাবু প্রাণকৃষ্ণ বাগচী প্রমুখ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের উদ্যোগে শাসকশ্রেণী ও ভারতবাসীর মধ্যে সম্পর্ক উন্নত করবার জন্য 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হলো। এই সোসাইটি প্রতিজ্ঞা করল ঃ

১। "এতৎ সভার মত এই যে পৃথক ব্যক্তিরা স্বতন্ত্র হইয়া দেশের উপকার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সাধারণ ব্যক্তিরা একমত হইয়া যাহাতে ভারতবর্ষের উৎকৃষ্টতা এবং কর্মক্ষমতা ও এতদ্দেশে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের চিরস্থায়ী রাজত্বে সাহায্য করিতে পারেন তজ্জন্য এই সভা স্থাপিত করা গেল, ইহাতে জাতি ধর্ম জন্মভূমি এবং পদের কোন প্রভেদ থাকিবেক না। সর্বপ্রকার মনুষ্য আসিতে পারিবেন।

২। এই সভার সভ্যেরা রাজবিদ্রোহী না হইয়া এবং ইংলণ্ডীয় রাজার আইনের অবিরোধে চালিত আইন সকল মান্য করত ভারতবর্ষের মঙ্গল চেষ্টা করিবেন।"

ইংরেজ শাসকশ্রেণীর বহু অবিচার, অত্যাচার, আচরণ সিদ্ধান্তকে বহুবার মধ্যবিত্তশ্রেণী তাদের পত্রপত্রিকায় সমালোচনা করেছে। যেমন পাতিয়ালার মহারাজের প্রতি অবিচারে সম্বাদভাস্কর ১৮৫৬, ১৮ মার্চ সম্পাদকীয়তে লিখলেন "ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যত রাজ্য বৃদ্ধি হইতেছে তাঁহারদিগের লোভের শরীর ততই প্রকাণ্ড হইয়া উঠিতেছে, যাঁহার শরীরে রুধির দেখেন তিনি মিত্রই হউন আর অমিত্রই হউন তাঁহার রুধির পান না করিয়া ছাড়া-ছাড়ি নাই; বিশেষত ডেলহৌসি বাহাদুর কি রাক্ষসী বেলায় ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তকরণ কেবল রাক্ষসী ব্যাপারেতেই নিযুক্ত ছিল।" সাঁওতাল বিদ্রোহকে সরাসরি সমর্থন না করলেও সাঁওতালদের ওপর অত্যাচারের বীভৎসতাকে অনেক ক্ষেত্রে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধাচরণ ও তার উৎখাত কখনই চান নি। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও গভীরতা ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে তুলল। শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে দেশের ধনিক শ্রেণী ও মধ্যবিত্তশ্রেণী ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হলেন। তারা ইংরেজের পক্ষে সমস্ত সমর্থন নিয়ে দাঁড়ালেন। বিদ্রোহে ইংরেজের বিজয়ের পর সম্বাদভাস্কর লিখছে (১৮৫৭, ২০ জুন), "ঊর্ধ্ব বাহু হইয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া নৃত্য কর, জয়ধ্বনি

দাও···আমাদের প্রধান সেনাপতি মহাশয় সসজ্জ হইয়া দিল্লী প্রবেশ করিয়াছেন······কি মঙ্গল সমাচার, পাঠক সকল জয় বলিয়া নৃত্য কর, হিন্দু প্রজাসকল দেবালয় সকলে পূজা দাও, আমারদিগের রাজ্যেশ্বর শত্রুজয়ী হইলেন।”

এখানে হিন্দু প্রজাসকলের উল্লাস লক্ষণীয়। উনিশ শতকে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ছিল নগণ্য। ইংরেজের প্রতি মুসলমানরা স্বার্থগত কারণে বিরূপ ছিল। ইংরেজ দেশের রাজা হয়ে দেখল মোট জমিদারীর চার ভাগের একভাগ জমি মুসলমান নিষ্করভোগীদের করায়ত্ত। ১৭৯৩তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ১৮১৯ বাজেয়াপ্ত আইন—এই দুটি আইনের বলে মুসলমানদের হাতের জমি বাজেয়াপ্ত করল। বাজেয়াপ্ত আইন যখন জারি করা হয় তখন বাংলার জমিদারদের শতকরা ৯৫জন ছিলেন মুসলমান, ৫জন হিন্দু। কিন্তু আইন পাশ হওয়ার ১০ বৎসরের মধ্যে অনুপাত একেবারে উল্টে গেল, মুসলমান জমিদারের সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র শতকরা ৫জন। [আজাদ, ৬ই বৈশাখ, ১৩৪৩. ফজলুল হকের ভাষণ] বহু প্রাচীন মুসলমান পরিবার ও মুসলিম প্রতিষ্ঠানের লাখেরাজী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলো। এই কাজে কোম্পানীর খরচ হল ৮ লক্ষ পাউণ্ড। লাভ করল ৩ লক্ষ পাউণ্ডের স্থায়ী আয়ের সম্পত্তি W. Hunter তাঁর Over Indian Musalmans এ লিখেছেন, “A hundred and seventy years ago, it was almost impossible for a well-born Musalman of Bengal to become poor but at present it is almost impossible for him to continue to be rich.” মুসলমান রাজত্বে সরকারী আওতায় থেকে মুসলমানরা প্রধানতঃ অর্থশক্তি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ইংরেজ শাসনে এই ক্ষমতা তাদের হাতে রইল না, তা গেল হিন্দুমধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত ফার্সি ভাষার সংবাদপত্রে (Durbin) এই সময়কার একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

“All sorts of employments great and small are being gradually snatched away from the Mahamadans and bestowed on men of the races particularly the Hindus. The govt. is bound to look upon all classes of its subjects with an equal eye. Yet

the time has now come when it publicly singles out Mahamadans into gazette for exclusion from official posts. Recently when several Vacancies occured in the Office of Sundarban's Commissioner that Official in advertising them in the govt. gazette stated that the appointment would be given to none but the Hindus."

সুতরাং ইংরেজ শাসনে ভৌমিক স্বার্থ ও ভবিষ্যৎ স্বার্থ বঞ্চিত মুসলমান সমাজ চেয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজ শাসন খতম হোক। আর হিন্দু ধনিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী আশংকা করেছিল ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটলে মুসলমান রাজশক্তি মঞ্চে ফিরে আসবে। অর্থাৎ স্বার্থরক্ষার প্রতিযোগিতায় ধনিক ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর হিন্দু মুসলমান অংশ ইংরেজের পক্ষে বিপক্ষে চলে যেতে লাগল। কিন্তু সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ মুসলমান পক্ষে বিপক্ষে বিভক্ত ছিল না। ইংরেজের বিরুদ্ধে তারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে। জনপদবাসী হিন্দু লড়াকু কৃষক পলাতক মুসলমান সিপাহীদের আশ্রয় দিয়েছে। সুচতুর ব্রিটিশ শাসক হিন্দু মুসলমানের এই ঐক্য লক্ষ্য করে আশঙ্কিত এবং সতর্ক হয়ে উঠেছিল। প্রথম থেকেই ইংরেজ মুসলমান সমাজকে বঞ্চিত রেখে হিন্দু মুসলমানের অনৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা করে আসছিল। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিরোধিতার মতো সাধারণ হিন্দু জনসমষ্টির বিপক্ষতা লক্ষ্য না করে ইংরেজ চিন্তিত হলো। উপলব্ধি করল যদি ইংরেজ রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী করতে হয়, সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ মুসলমানের এই ঐক্যকে ভাঙতে হবে। এ বিষয়ে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু তাঁর The Indian Struggle গ্রন্থে লিখেছেন, "In the great Revolution of 1857, Hindus and Muslims had fought side by side against the British"..."If the Indian people cannot be divided, then the country India has to be divided geographically and politically."

দেশবাসীকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ বিভক্ত করতে পারল এবং এই অনৈক্যকে স্থায়ী করতে দেশটাকেও ভৌগোলিকভাবে, রাজনীতিগতভাবে বিভক্ত করে দেবার চেষ্টায় সফল হল।

এই সতর্ক ও কুশলী সাম্রাজ্য লিপ্সু ব্রিটিশ শাসকের হাতে সিপাহী

বিদ্রোহের পর এই মধ্যবিত্তশ্রেণী বড় রকমের মার খেল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমান অংশ ইংরেজের প্রতি ক্রুদ্ধ তো ছিলই, হিন্দু অংশ অসন্তুষ্ট হলো। কারণ মধ্যবিত্ত হিন্দু অংশ বিদ্রোহে সাহায্য করে বহু প্রত্যাশায়, নবীন উদ্যমে ইংরেজের দিকে ঝুঁকতে গিয়ে দেখল, কৃপাবর্ষণ দুরস্হ, পূর্বের মতো ইংরেজ প্রশ্রয় দিচ্ছে না। বরং তারা বোধ করল বিজয়ী ইংরেজের কাছে তারা নানাভাবে প্রতারিত হচ্ছে, তাদের কপালে খারাপ-ব্যবহার জুটছে। তার ওপর যুদ্ধের ব্যয়ভারের বোঝা সরকার জনগণের কাঁধে চাপিয়ে দিল। কর বাড়ল, দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি ঘটল, খাদ্যাভাব দেখা দিল। ১৮৫৮-এ পার্লামেন্টের হাতে শাসনভার দিয়ে রাণী ঘোষণা করলেন যোগ্যতামতো, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সরকারী চাকরী দেওয়া হবে। অনেক প্রতিশ্রুতিও দিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের ধকলটা কিছুটা সামলে নিতে কিছু কিছু করা হলো না, তা নয়। মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যা ছিল নগণ্য, তা ওপরে উঠতে লাগল। কিন্তু ইংরেজ শীঘ্র প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল। হিন্দু-মুসলমান মধ্যবিত্তরা আবার আঁকড়ে ধরতে গিয়ে, স্নেহান্বিত হতে গিয়ে ঘা খেল। মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বার্থবিরোধী নানা আইন ও বিল প্রণয়ন করা হলো। যেমন, সিবিল সার্ভিস আইন, দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন, অস্ত্র আইন, ইলবার্ট বিল। সুরেন্দ্র নাথ আই. সি. এস পাশ করলেন, অথচ তাকে চাকরি দেওয়া হোল না। সরকারের Assistant Secretary-র একটা পদ ছিল। সরকারের সকল বিভাগ থেকে Assistant Secretary-র পদ বিলুপ্ত করা হলো, রাখা হলো Under Secretary-র পদ। এতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্ষিপ্ত হলো। বেঙ্গলী, স্টেটসম্যান পত্রিকায় লেখালেখি হলো, ক্ষুব্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতি সরকারের ঔদাসীন্য ব'লে সমালোচনা করা হলো। মধ্যবিত্তরা দেখল ক্রমশঃ তারা হঠতে শুরু করেছে, তাদের অস্তিত্ব ধ্বংসের মুখে, তাদের ভবিষ্যৎ স্বার্থরক্ষা বিপন্ন। দেশে দেশে স্বার্থরক্ষার প্রতিযোগিতায় হঠতে গিয়ে মধ্যবিত্তরা যা করে এসেছে, আমাদের মধ্যবিত্তরাও তাই করল। প্রতিযোগিতার চাপে মধ্যবিত্তের বিচক্ষণ অংশ বর্তমান স্বার্থ নয়, ভবিষ্যৎ স্বার্থে ইংরেজের বিরোধিতায় নামল। ১৮৪৩-এ মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে ঘোষণা করেছিল,—রাজবিদ্রোহী না হয়ে তারা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের চিরস্থায়ী রাজত্বে সাহায্য করবে,—১৮৫৭-র পর

সেই ঘোষণা ঘুরিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজত্ব উচ্ছেদ করতে রাজদ্রোহী হয়ে উঠল, এবং সে কাজ করল হিন্দু মুসলমান 'ঐক্যবদ্ধ ভাবেই'। এল নবজাতীয়তাবাদ, ১৮৮৫-তে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হলো। এই শতকের প্রারম্ভে দুই দশকেই ব্রিটিশদ্রোহিতা শুরু হলো ব্রিটিশ পণ্য বর্জন ও সন্ত্রাসবাদের মধ্য দিয়ে।

অনিচ্ছাভরে, কার্পণ্য সহকারে শিক্ষিত ভারতের দেশী অধিবাসীদের মধ্য থেকে এই মধ্যবিত্তশ্রেণীটিকে গড়ে তুলে ইংরেজ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন অবসানে ইতিহাসের অচেতন হাতিয়ারের কাজ করল। মার্কস্ তার ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল রচনায় লিখেছেন "হিন্দুরা নিজেরাই ইংরেজের জোয়াল একেবারে ঝেড়ে ফেলার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী যতদিন না হচ্ছে, ততদিন ভারতীয়দের মধ্যে বৃটিশ বুর্জোয়া কর্তৃক ছড়িয়ে দেওয়া এই সব নতুন সমাজ-উপাদানের ফল ভারতীয়রা পাবে না।" ভারতের শ্রমিক কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে এই মধ্যবিত্তশ্রেণী সহ্য করেছিল সাম্রাজ্যবাদী আক্রোশের প্রধান আঘাত। আর অসহযোগ আন্দোলন নিভে যাওয়ার পর থেকে মধ্যবিত্তের খুব ভালো অংশ শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করল।

স্বাধীনতা-উত্তর দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে প্রাকস্বাধীনতা সেদিনকার অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে চাইলে চলবে না। আজকের মধ্যবিত্ত শ্রেণীও নিশ্চয়ই দেশীয় বুর্জোয়া জমিদার শাসক শ্রেণীর স্নেহান্বিত আনুষঙ্গিক অংশ। কিন্তু বিশ্ব জুড়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষয়িষ্ণুতার জন্য এবং ভারতবর্ষে বৃহৎ বুর্জোয়াবর্গের নেতৃত্বে চালিত বুর্জোয়া জমিদাব শাসক শ্রেণীর তীব্র সংকটের ফলে ভারসাম্য রক্ষা করতে মধ্যবিত্তশ্রেণী অস্থির ও অসহায় হয়ে পড়েছে। শ্রমিক কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে মধ্যবিত্তশ্রেণীও ভারতের শাসক শ্রেণীর আঘাত সহ্য করছে। জীবনযুদ্ধে শ্রমিক কৃষকের সঙ্গে তারাও মার খাচ্ছে, শোষণযন্ত্রের শিকারে তারাও পরিণত হচ্ছে। মধ্যবিত্তরা প্রবলভাবে দুলছে। তারা ভারসাম্য সন্ধানে চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত। মধ্যবিত্তের মধ্যে বিভিন্ন যে লোক থাকে, তার একদল বর্তমান স্বার্থের সাধনে, পরিবর্তনের ভয়ে, প্রতিযোগিতার চাপে হঠে গিয়ে শাসক শ্রেণীর গা লেপটে থাকতে চাইছে, ভাবছে আশালতা শাসকশ্রেণীর মাচায় তুলে

দিলে যদি ফল ফলে। ভারতবর্ষে দুটি বছর ধরে জরুরী অবস্থার যে করাল রূপ দেখা দিয়েছিল—তা ছিল মধ্যবিত্তশ্রেণীর চরিত্রধর্মের আরেক নির্ণায়ক ঘটনা। মধ্যবিত্তের একাংশ ঘুরে গিয়ে শাসক শ্রেণীর পক্ষ নিল। এই মধ্যবিত্ত চরিত্রের এক চমৎকার নিদর্শন হলেন ভারতবর্ষের প্রখ্যাত চিত্রকর এম্ এফ্ হোসেন। ২৫।৭।৭৫ তারিখের 'সত্যযুগ' পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল—

'প্রধানমন্ত্রীকে শিল্পীর উপহার'

'নয়াদিল্লী, ২৪ জুলাই—প্রখ্যাত চিত্রকর এম্ এফ্ হোসেন আজ তাঁর নিজের হাতে আঁকা তিনটি ছবি প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দিলেন। ছবি তিনটির প্রত্যেকটিকে দেশের বর্তমান পরিস্থিতির প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম ছবিটির নাম দেয়া হয়েছে ১২ জুন। রামায়ণের নায়িকা 'সীতা'র বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পটভূমিকায় এটি আঁকা। দ্বিতীয়টির নাম '২৪ জুন এতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে দেশে বিশৃংখল অবস্থার চেহারাটি। তৃতীয় ছবিটির নাম দেওয়া হয়েছে '২৬ জুন। এই ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে ভগবতী দুর্গা অশুভ শক্তির সঙ্গে লড়াই করছেন।'

আবার এরই পাশে জরুরী অবস্থার মধ্যেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এমন অংশও দেখা গেল যারা শ্রমিক কৃষকশ্রেণীর সঙ্গে শাসকশ্রেণীর আক্রোশের আঘাত সহ্য করল, ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করল এমনকি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিল। মধ্যবিত্তের এই অংশ গত ত্রিশ বছর ধরেই স্বাধীনতা-উত্তর শাসকশ্রেণীর ভূমিকা লক্ষ্য করে বিক্ষুব্ধ। তারা উপলব্ধি করেছে 'শাসকশ্রেণী জরুরী ও আশু কোন প্রয়োজনই সাধন করেনি। তারা না পেরেছে ঔপনিবেশিক অতীতের কুৎসিত অবশেষগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে, না পেরেছে দ্রুতবেগে অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা ও পশ্চাদপদতা কাটিয়ে উঠতে।' তাদের আশা ছিল অনেক, কিন্তু সবই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। তাদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তারা দেখল তাদের অস্তিত্ব ধ্বংসের মুখে তাদের ভবিষ্যৎ স্বার্থরক্ষা বিপন্ন। প্রতিযোগিতার চাপে তারা সরকারের বিরোধিতায় নামল।

মধ্যবিত্তের বিচক্ষণ, ভদ্র, ভালো অংশ বুঝেছে,—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গেল গেল—বলে হা-হুতাশ প্রাজ্ঞতা নয়। ইতিহাসের অমোঘ সত্য সাধিত হচ্ছে। ভবিষ্যৎ স্বার্থেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই বিচক্ষণ অংশ নিজেদের স্থান সম্বন্ধে দ্রুত সচেতন হচ্ছে।

মে দিবসের আহ্বান

মেহনত-করা-মানুষের কাজের সময় স্থির করার সংগ্রাম মে দিবসের সংগ্রামের গোড়ার কথা। শ্রমিকের শ্রমের ন্যায্য মূল্য পাওয়া এবং তার কাজের সময় স্থির করা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একজন শ্রমিকের বেঁচে থাকার জন্য ব্যয়টা এবং সন্তান পালনের জন্য ব্যয়টাই তার শ্রমের মূল্য। যদি চার ঘণ্টা শ্রম করে ঐ মূল্য অর্জন করা যায়, তবে তার চাইতে যত বেশি সময় শ্রমিককে মালিক খাটাবে, তত বেশি উদ্বৃত্ত মূল্য মালিক লাভ করবে। সেইজন্য পুঁজিপতির স্বার্থ হচ্ছে কাজের সময় দীর্ঘতর করে সবচেয়ে বেশি উদ্বৃত্ত মূল্য ভোগ করা। আর শ্রমিকের স্বার্থ হলো শ্রমের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার স্বার্থ, কাজের স্বাভাবিক সময় স্থির করার স্বার্থ। মার্কস্ এই সত্য উদ্ঘাটন করে বলেছেন, "স্বাভাবিক কাজের সময় স্থির করাটাই একটা গৃহযুদ্ধের ফল।" পুঁজিবাদের জন্মলগ্ন থেকে সে যুদ্ধ চলছে। "পুঁজি হচ্ছে মৃতশ্রম। রক্ত চোষা বাদুড়ের মতো জীবন্ত শ্রম শোষণ করেই সে বাঁচে। যত বেশি শোষণ করবে তত বেশি বাঁচবে।" এই জন্য যতকাল পুঁজিবাদ শ্রমিক ও তার সহযোগী সর্বস্তরের মানুষের জীবন্ত শ্রম শোষণ করে বাঁচতে চাইবে ততকাল তার বিরুদ্ধে মে দিবসের সংগ্রাম চলবে,—উত্তরণের মধ্যদিয়ে রূপান্তরের মধ্যদিয়ে। মে দিবস এই বিকশিত সংগ্রামেরই ডাক দিয়ে যায়।

আমরা যারাই শ্রমের ন্যায্য মূল্য পেতে চাই, একটা সুখের সংসার চাই, যুদ্ধের বিপদ মুক্ত, মানুষের অত্যাচার মুক্ত একটা সুন্দর সচ্ছল মর্যাদাপূর্ণ সমাজ পেতে চাই তাদের সে অধিকার আদায় ক'রে নেবার সংগ্রামে মে দিবস অনুপ্রেরণা দেয়। সেই লক্ষ্যেই এই শতবছর ধরে মে দিবস ডাক দিয়ে আসছে এবং সফলতার মশাল জ্বালিয়ে দিচ্ছে। মে দিবসের এই গুণগত উত্তরণ ও রূপান্তর খুবই তাৎপর্যপূর্ণ! শ্রমিকশ্রেণীকে তা উপলব্ধি করতে হবে, অনুশীলন করতে হবে, আয়ত্ত করতে হবে। মে দিবসের উত্তরণের রূপটা কী?

(ক) ১৮৮৬ সালের একটা শহরের ঘটনা দুনিয়ার এক অসাধারণ গুরুত্বের ঘটনায় রূপান্তরিত হলো।

(খ) একটা শহরের মেহনত করা মানুষের অমানুষিক কাজের সময় হ্রাস করার দাবী দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্তর্জাতিক দাবীতে উত্তীর্ণ হলো।

(গ) কাজের ঘণ্টা কমাবার সংগ্রাম গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে রূপান্তরিত হলো ও স্বেচ্ছাচার, স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাসে উত্তীর্ণ হলো।

(ঘ) কাজের ঘণ্টা কমাবার অর্থনৈতিক দাবী পূরণের ডাক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মাধ্যমে সর্বহারার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের আহ্বানে উত্তীর্ণ হলো। তারই ফলশ্রুতি নভেম্বর বিপ্লব, চীন বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক দেশের সংখ্যাবৃদ্ধি, দেশে দেশে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়, দেশে দেশে শোষণ-মুক্তির জোরদার সংগ্রাম।

(ঙ) মে দিবসের সংগ্রাম এখন শ্রমিক সংহতির প্রতীক হয়ে উঠেছে। শ্রমিক সংহতির সংগ্রাম আজ বিশ্বের মুক্তি সংগ্রামের হাতিয়ার ও দিশারী। মে দিবসের এই উত্তরণের রাজনৈতিক চেতনায় জাগরিত হতে পারলে শ্রমিকশ্রেণী দুনিয়াবিজয়ী দুর্ভেদ্যশক্তি হয়ে উঠতে পারে।

মে দিবসের উদ্‌যাপন যখন এই ডাক দেয়, যখন শ্রমিকশ্রেণী ও তার সহযোগী মানুষকে উত্তরণের এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে—তখন মালিকশ্রেণী, শোষক শাসকশ্রেণী আতঙ্কিত হয়। কারণ এই আহ্বানের মধ্যে তারা তাদের মৃত্যু ঘণ্টাধ্বনি শোনে। আর এই উদ্‌যাপন যদি হাসপাতালে হাসপাতালে আর্তদের মধ্যে ফল ফুল মিষ্টি বিতরণে অবরুদ্ধ থেকে যায়, উৎসবের অবকাশে ও জৌলুষে উচ্ছল থেকে যায়, মালিকশ্রেণী খুশী হয়, শ্রমিক সংগঠনকে মে দিবসের এহেন উদ্‌যাপনে অর্থ মঞ্জুর করে; সাহায্য ও সহযোগিতা দেয়।

মে দিবসের এই আহ্বানের আলোতে আমাদের দেশের শ্রমিশ্রেণীকে দুটি করণীয় বুঝে নিতে হবে:—

১। এক হচ্ছে শ্রেণীগত ভাবে শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি কী, তারা কারা—তা উপলব্ধি করা। নিজেকে জানো, না জানলে নিজের শক্তি ও করণীয় সম্পর্কে সক্রিয় সাহসী হওয়া যায় না। ইতিহাসের চালিকাশক্তি হলো শ্রমিকশ্রেণী ও তার সহযোগী জনগণ। তাবৎ বস্তুমূল্যের, আত্মিকমূল্যের স্রষ্টা তারা। সৃষ্টির অফুরন্ত উৎস তারা। খেটে খাওয়া সর্বস্তরের মানুষের মুক্তিদাতা শ্রমিকশ্রেণী। জয় করার জন্য সারা দুনিয়া পড়ে আছে তার কাছে এবং বিজয়ী হবার মন্ত্র আছে তার জানা। শ্রমিকশ্রেণীর এই আত্মশক্তির উপলব্ধি ঘটে সংগ্রামের সাফল্য ও অসাফল্যের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, বলিদানের মহত্বের শিহরণের মধ্য দিয়ে, মে দিবস পালনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক চেতনায় জন্ম নিতে নিতে। এই সঠিক উপলব্ধিতেই শ্রমিকশ্রেণী দৃঢ়-সংকল্প ও সবল হয়ে ওঠে; ভীতিপ্রদ কিন্তু উদার হয়ে ওঠে; শ্রাবণের বর্ষণ-উন্মুখ মেঘের মতো ভীষণ অথচ বৃষ্টিসুধাগর্ভ হয় তার স্বরূপ। তখন সে রাজনৈতিক মঞ্চের নকল রাজা বাদশাকে আর কুর্নিশ করে না, আসল রাজার অধিকার নিয়ে রাষ্ট্রবিপ্লব সাধন করে, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করে, দেশবাসীর আশীর্বাদ গ্রহণ করে। শ্রমিকশ্রেণীকে এই আত্ম উপলব্ধির শক্তিতে জাগ্রত করাই মে দিবসের আহ্বান।

২। দ্বিতীয় করণীয় হচ্ছে নিজেদের এই শক্তি ও ক্ষমতা জেনে নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে মে দিবসের সঙ্গে তার দেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় রাজনৈতিক দাবিগুলি যুক্ত করে দিতে হবে, এক সূত্রে গ্রথিত করতে হবে। এই হলো মে দিবস সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষা। আবার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নটিকে মে দিবসের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। স্তালিন এই আহ্বান জানিয়েছেন।

মে দিবসের এই চেতনার আলোকে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীকে দেশের অভ্যন্তরে দেখতে হবে, তাদের বুঝতে হবে ঃ—

(১) দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে তাদের ভূমিকা কী।

(২) একটা সুখী সচ্ছল মর্যাদাপূর্ণ শান্তির সংসার ও সমাজ গড়ে তুলতে তাদের ভূমিকা কী।

আমাদের দেশে আজ সবচেয়ে বড়ো বিপদ ভারতের ঐক্যের চ্যালেঞ্জ। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীকে তা বুঝতে হবে। ভারত ঐক্যবদ্ধ না থাকলে,

বিচ্ছিন্নতা সাম্প্রদায়িকতা কুসংস্কারে ছিন্ন ভিন্ন নিদ্রিত হলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে শ্রমিক শ্রেণী ও তার সহযোগী সাধারণ মানুষ। সেই বিপদই আজ প্রবল হয়ে গ্রাস করছে ভারতকে। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ঘণীভূত হচ্ছে, সংকীর্ণ আঞ্চলিক ভাবাবেগ প্রবল হয়ে উঠছে; কুসংস্কার অমঙ্গলের দীর্ঘ ছায়া ফেলে ফেলে চলছে। জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তিগুলির প্রসার ঘটছে। বাইরের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ মদত দিচ্ছে এবং সে মদতে দেশের ভেতরে বিচ্ছিন্নতা-বাদী শক্তি ভারতের অখণ্ডতা ও ঐক্য বিপন্ন করে তুলছে। এদের তীক্ষ্ণ লক্ষ্য ভাষা-ধর্ম-জাতপাতের লড়াইকে প্রবল করে তোলা। অতীতের ইতিহাস হলো,—ধর্মীয় ও আঞ্চলিকতাবাদের পাণ্ডারা দেশের শিল্পাঞ্চল-গুলিকেই বেছে নেয়, হিংসাত্মক এই সব কার্যকলাপ তীব্র করে তোলার জন্য। খালিস্তান গোর্খাল্যান্ড ইত্যাদি দুঃস্বপ্ন ভারতের ভুবনে রাহুর মতো ছুটে আসছে। মুসলীম নারী বিল-এ ধর্মীয় গোড়াতন্ত্রের কাছে ভারত সরকারের আত্মসমর্পন আরেক বড়ো পরিমাপের দুঃস্বপ্ন। এই সব দুঃস্বপ্নকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে শ্রমিকশ্রেণীকে। শ্রমিকশ্রেণীকে সচেতনতায় জাগ্রত হয়ে বুঝতে হবে তাদের শত্রুভাবাপন্ন শাসকশ্রেণীই এই সবকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, দিয়ে আসছে। কখনও কখনও এই সব অপশক্তিকে ভোটের কাজে ব্যবহার করছে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করতে কাজে লাগাচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণী সচেতন না হলে কখনওই বুঝতে পারবে না যে তাদের ট্রেড-ইউনিয়নকেও তাদের প্রকৃত স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে, ট্রেডইউনিয়নের অস্ত্র ভারতকে বিচ্ছিন্ন করতে কাজে লাগাচ্ছে। একটি ট্রেডইউনিয়কে ঘিরে আছে অনেক ট্রেডইউনিয়ন। চোখ বড়ো বড়ো করে খুঁজে নিতে হবে কোনটা শ্রমিকের যথার্থ স্বার্থে লড়ছে। শ্রমিক শ্রেণীর কাছে এও একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি সচেতনতাই পারে যথার্থ দেখতে। মে দিবস সেই ভূমিকা পালনের আহ্বান দিয়ে যায়।

(২) ভারতের শ্রমিক শ্রেণীকে বিশ্বাস করতেই হবে যে তারাই পারে তাদের সহযোগী মানুষদের সঙ্গে নিয়ে শত্রুভাবাপন্ন সমাজ ব্যবস্থাটাকে বদলে দিতে, সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সংগ্রাম সংগঠিত করতে

এবং সে লড়াইয়ে বিজয়ী হয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে। এবং একমাত্র সেই সমাজেই প্রকৃত স্বাধীনতা, প্রকৃত মর্যাদা, সংসারের প্রকৃত সুখ ও শান্তি সম্ভব। শ্রমিক শ্রেণীর সহযোগী বিভিন্ন স্তরের জনগণকেও বুঝতে হবে—শ্রমিক শ্রেণী মুক্তির সংগ্রামে জয়ী হলে ছুটে এসে আগে মুক্ত করবে বন্ধুদের বন্ধন এবং অধিকৃত সাম্রাজ্যের শান্তি সুখে পেঁছে দেবে তাদের। শ্রমিক শ্রেণী এতো উদার। এই জন্যই কর্মচারী, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীদের ভালো ও বুদ্ধিমান অংশ নিজেদের সুখ-শান্তি মুক্তির স্বার্থে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির সংগ্রামে সাহায্য করে, শ্রমিক শ্রেণীর পাশে এসে মিত্রের মতো দাঁড়ায়।

শ্রমিকশ্রেণী বিশ্ব ইতিহাসের চালিকা শক্তি বলেই কেবল ভারতের অভ্যন্তরে দেখে নীরব থাকতে পারে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আজ শ্রমিক শ্রেণীর কাছে বড়ো বিপদ যুদ্ধের বিপদ। যুগ যুগ ধরে সাধারণ মানুষের মেহনতে ও সংগ্রামে গড়া এই সভ্যতা, এই প্রিয় পৃথিবী ধ্বংস হতে দেবো না, মানুষের প্রিয় বাসস্থানকে যুদ্ধদানবের পদভারে পিষ্ট হতে দিতে পারি না, মানুষের রক্তে মাটি ভিজতে দেবো না, নীলাকাশ মানুষের হাহাকারে বিদীর্ণ হতে দিতে পারি না—এই চ্যালেঞ্জ শ্রমিকশ্রেণীর কাছে খুব সুন্দর, বড়ো ও পবিত্র একটা আবেগের চ্যালেঞ্জ। ভারতের শ্রমিক-শ্রেণীও এই আবেগকে সফল করতে পারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুনিয়ার শ্রমিকের সঙ্গে এক হয়ে পুঁজিবাদকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে। কারণ পুঁজিবাদেরই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ মাথা চাড়া দিয়েছে যুদ্ধের বীভৎসায়, শান্তির পক্ষে বিপদে। শ্রমিকশ্রেণীর অঙ্গীকার হবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি রক্ষা। তখনই যুদ্ধবাজদের ধ্বংসের লক্ষ্য থেকে শ্রমিকশ্রেণী ও তার সহযোগীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা রক্ষিত হবে। মে দিবসের আহ্বানও তাই।

দেশের ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন পারে শ্রমিকশ্রেণীকে মে দিবসের এই উত্তরণের রাজনীতিতে জাগ্রত করতে, শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা বর্ধিত করতে। সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে পেঁছিতে ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। ভারতের যথার্থ ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনই শ্রমিক

শ্রেণীকে এই প্রদীপ্ত উপলব্ধিতে জাগ্রত করতে পারে যে ভারতবর্ষে সামন্ত-তন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্র এখনো সমঝোতা করে কায়েম হয়ে আছে তারই ফলে আমাদের দেশে ঘরে ঘরে সুখ নেই। এই পরিস্থিতিতে আমূল সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সংগ্রাম সংগঠিত করা প্রয়োজন এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের এই সংগ্রামে বিজয়ী হওয়াও সম্ভব। মে দিবসের শতবর্ষে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষাকারী ট্রেড়ইউনিয়নের অঙ্গীকার হবে এই শক্তিতে ও করণীয় ভূমিকায় শ্রমিক শ্রেণীকে উদ্বুদ্ধ করানো। শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগী বুদ্ধিমান ও ভালো-মানুষের কামনা,—মে দিবসের শতবর্ষের শিক্ষা নির্দয় আঘাতে আঘাতে শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে ভারতকে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার স্বর্গে জাগরিত করুক।

———

শিক্ষার শক্তি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

॥ ১ ॥

শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন এক জাগরী শক্তিরূপে। অশক্তকে শক্তি দেবার একটিমাত্র উপায় শিক্ষা। মানুষকে শিক্ষা দেওয়া চাই—রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তার এ হলো প্রথম কথা এবং প্রধান কথা। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শন শিক্ষার এই শক্তি দর্শন। শিক্ষা বলতে তিনি কেবল একটুখানি পড়া ও লেখা ও অঙ্ক কষা বোঝান নি; ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে উপযোগী ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য বিধি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে সহজ উপলব্ধি এবং মূল্যায়নের ক্ষমতাকে বুঝিয়েছেন। মাতৃভাষায় বাহিত হয়ে এই শিক্ষাই শক্তির রূপ নেয়। শিক্ষার এই শক্তির কথা নানা প্রসঙ্গে, নানাভাবে বিভিন্ন সময়ে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। সে সব চয়ন ক'রে একত্র করলে এরকম দাঁড়ায়ঃ—

শিক্ষার শক্তিই দেশের মানুষকে আলোয় জাগিয়ে তুলতে পারে, মানুষের মনের চেহারা, দেশের চেহারা বদলে দিতে পারে। শিক্ষার শক্তিতে মূক ভাষা পায়, যারা মূঢ় থাকে তাদের চিত্তের আবরণ উদ্ঘাটিত হয়, যারা অক্ষম তাদের আত্মশক্তি জাগরূক হয়, দাস্যভাব দূরিত হয়। আমি সব পারি, সব পারব; এই আত্মবিশ্বাসের বাণী দিতে পারে শিক্ষা। এ বাণী থেকে মানুষ আপন ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। এই শ্রদ্ধার দ্বারা মানুষ নির্ভীক হয়, জলে স্থলে আকাশে সে জয়ী হয়। না হলে দৈবের দিকে তাকিয়ে থাকে, দৈবপ্রবঞ্চিত হয়। এই আত্মশক্তি থেকেই স্বাধিকার বোধ আসে। স্বাধিকার উপলব্ধিতে নির্যাতন ঠেকানো যায়, ক্ষমতালোলুপের স্বার্থ সাধনের উপকরণে পরিণত হতে সে বাদ সাধে। অবমাননার তলায় তলিয়ে থাকা মানুষ সমাজের অন্ধ কুটুরি থেকে বেরিয়ে এসে অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে দাঁড়িয়ে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী হয় শিক্ষার শক্তিতে। শিক্ষার শক্তি মানুষকে মানুষ করে তোলে।

মানুষের সকল সমাধানের শক্তি রাখে শিক্ষা। অন্ন, স্বাস্থ্য, শান্তি

সমস্তই শিক্ষার ওপর নির্ভর করে। শিক্ষার যোগে অর্থ উৎপাদনের শক্তি বহুগুণ বাড়ে। চাষীকে শিক্ষা দিলে চাষ করবার শক্তি বাড়ে। দেশের ও দেশবাসীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

শিক্ষা মানুষকে শেখায় কিভাবে বস্তুর নিয়ম আবিষ্কার করে সে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য স্থাপন করতে পারে। শিক্ষা মানুষকে পরিবার বোধ থেকে সমাজ বোধে, সমাজ বোধ থেকে স্বদেশ বোধে এবং স্বদেশ বোধ থেকে বিশ্ববোধে পরিচালিত করে। সুশিক্ষা মানুষকে বিশ্বমনা করে। শিক্ষায় মানুষের সঙ্গে মানুষের জগৎজোড়া মিল বেরিয়ে পড়ে। সে মিলের জোট দেশভেদ ও কালভেদকে ছাড়িয়ে যায়। আমার দেশের এক কোণে যে ছেলে পড়াশুনা করছে তার সঙ্গে য়ুরোপের প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশী সত্য, তার দুয়ারের পাশের শিক্ষা বঞ্চিত প্রতিবেশীর চেয়ে। এই মিলের পরম প্রয়োজন এবং পরম আনন্দ।

শিক্ষার বড়ো শক্তি তা সাম্প্রদায়িকতা দূর করে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা, জাতিবর্ণ বিচার দূর করে। ঐক্য সাধনে মানুষকে জাগিয়ে তোলে শিক্ষা। শিক্ষার ঐক্যযোগে চিত্তের ঐক্য রক্ষা হয়, সমাজের ঐক্য রক্ষা হয় এবং সবচেয়ে রক্ষা হয় ন্যাশনাল ঐক্য।

যুগশিক্ষার উদ্বেল ধারা যদি মাতৃভাষার মাধ্যমে আনা যায়, দেশের শুষ্ক নদীর রিক্তপথে বান বয়ে যাবে। দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত সচেষ্ট সচেতন হয়ে উঠবে। দেশের মানুষের সামনে একটা নতুন আশার বীথিকা দিগন্ত পেরিয়ে অবারিত হবে; সর্বত্র জীবনের বেগ পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত হবে। শিক্ষার শক্তির এ হলো পূর্ণ প্রকাশ।

শিক্ষার এই পূর্ণ শক্তিতে যে কোনো ভেদ সৃষ্টির চেষ্টার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। শিক্ষার এই শক্তি দিয়ে দেশে বাছাই করা সেরা একটা অংশ তৈরী করা হবে আর সাধারণের কাছে শিক্ষা থাকবে দুর্লভ ও দুর্মূল্য— রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষা চিন্তাকে বলেছেন দেশের সবচেয়ে বড়ো জাতি-ভেদ ও শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা। শিক্ষার বিশিষ্ট রূপ নয়, তার থাকবে সাধারণ রূপ। আধুনিককালের নতুন বিদ্যার প্রবাহ সর্বজনীন দেশের অভিমুখে বইবে। বৃষ্টির মতো শিক্ষার এই অমৃত শক্তির সারা দেশ জুড়ে বর্ষণ কাম্য; নদীর মত তা দেশের এক ধার দিয়ে বয়ে চলবে না। ফসলের

সবচেয়ে বড় বন্ধু বৃষ্টি, নদী তার অনেক নিচে ; শুধু তাই নয়, এই বৃষ্টিধারার ওপরেই নদীজলের গভীরতা, বেগ এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

এই শক্তির গুণেই শিক্ষা প্রাণের খাদ্যে পরিণত হতে পেরেছে। তাতে দুর্ভিক্ষ আনতে চাইলে একদিন তা মার মূর্তি ধরে আসবে। সে মূর্তি রূপ নেবে বিচ্ছেদের, অস্পৃশ্যতার, কুসংস্কারের, সাম্প্রদায়িকতার, জাতি-ভেদের, প্রবলতর অনৈক্যের। অশিক্ষার শুষ্ক বাতাসের উষ্ণ নিঃশ্বাসের প্রাণনাশা মরুর আক্রমণে দেশ মরণের দিকে ঝুঁকবে।

পরাধীন স্বদেশে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন, অশিক্ষার এই মার মূর্তি। ইংরেজ রাজা শিক্ষার জাগরী শক্তিতে দেশের অধিকাংশ মানুষকে কখনও জাগ্রত করতে চায় নি। দেশের গণ্যমান্য কিছু লোকের সমর্থনে সরকার সর্বজনীন শিক্ষাকে উপেক্ষাই করেছে। শিক্ষার দেশব্যাপী বর্ষণের বেলায় সহস্রচক্ষু সরকারের ৯৯০টি চক্ষুই নিদ্রা দেয়। জনসাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য, শিক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্দের সময় রাজকোষের দোহাই দিয়ে ব্যয় সংকোচ করতে হয় ; অথচ এদেশে শাসন ব্যবস্থায় ব্যয়ের অজস্র প্রাচুর্য একেবারেই দরিদ্র দেশের মতো নয়। তার ব্যয়ের পরিমাণ স্বয়ং পাশ্চাত্য ধনী দেশকেও অনেকদূর ছাড়িয়ে গেছে। উলটে ইংরেজ সরকার শিক্ষার বিস্তারকে অনাদর করে আধুনিক বিদ্যা বাছাই করা বিশিষ্ট রূপের শিক্ষার কিছু কিছু উপায় করে দিল। শিক্ষার এই বিশিষ্ট রূপের সেচ পেয়ে সমাজের মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান শহরবাসী একদল মানুষ উর্বর হয়ে উঠল। এই সুযোগে তারা শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে ; তারাই হল এনলাইটেন্ড, আলোকিত। এই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণগ্রহণ। শিক্ষা দিয়ে ঐক্য না ঘটিয়ে ইংরেজ মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটাল। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের শ্রেণীভেদ আনল। যে সমাজের এক অংশে শিক্ষার আলো পড়ে, অন্য বৃহত্তর অংশ থাকে শিক্ষাবিহীন, সে সমাজ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত। ইংরেজ এই বিচ্ছেদের ছুরি দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে টেনে দিল।

॥ ২ ॥

স্বদেশে শিক্ষার শক্তির প্রবল উপেক্ষা দেখে এবং ইংরেজ সরকারের হাতে

শিক্ষার বিড়ম্বনায় রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হলেন। এই বেদনার মধ্যে যখন শুনলেন সদ্যমুক্ত বিপ্লবজাগ্রত সোভিয়েত রাশিয়া শিক্ষার এই জাগরী শক্তি উপলব্ধি করে জনসাধারণের শিক্ষা প্রায় শূন্য অঙ্ক থেকে প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়ে তুলেছে, অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া যেতে উৎসুক হলেন। গভীর আবেগে বললেন ভাঙা শরীর যদি ভাঙে তো ভাঙুক, ওখানে যেতেই হবে।

রাশিয়ায় গিয়ে তিনি শিক্ষার শক্তির যথার্থ প্রয়োগ দেখলেন; উৎফুল্ল হলেন। যথার্থ শিক্ষার এক বিরাট পর্ব এখানে শুরু হয়েছে। দেখলেন একটিমাত্র শক্তি ওদের এগিয়ে দিয়েছে সে হলো ওদের শিক্ষা কী আশ্চর্য উদ্যমে সর্বত্র লোক শিক্ষা ব্যাপ্ত হচ্ছে। শিক্ষার পরিমাণকে ওরা সংখ্যার মাপ ছাড়িয়ে সম্পূর্ণতায়, প্রবলতায় নিয়ে যাচ্ছে। কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা হয়ে না থাকে এ জন্যে কী প্রচুর আয়োজন ও কী বিপুল উদ্যম! শুধু শ্বেত রাশিয়ার জন্যে নয়—মধ্য এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে—সায়েন্সের শেষ ফসল পর্যন্ত যাতে তারা পায় এই জন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই।

রাশিয়ার শিক্ষার আরেক শক্তির প্রকাশ দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হলেন। স্বদেশে দেখেছেন বা অন্য দেশে দেখেছেন শিক্ষা যে করে শিক্ষার ফল তারই —দুধু ভাতু খায় সেই। কিন্তু এখানে দেখলেন প্রত্যেকের শিক্ষায় সকলের শিক্ষা। সম্মিলিত শিক্ষার যোগে একটা সম্মিলিত মন জেগেছে, যে মন বিশ্বসাধারণের কাজে সফল করতে চায়। শিক্ষার শক্তি জনগণকে বিশ্বমনা করেছে। মাত্র আট বছর কাজ করার সময় পেয়েছে, তবু এই স্বল্পকালেই রাশিয়ার বিরাট রাজ্যে প্রজাসাধারণের মধ্যে যে অদ্ভুত দ্রুতগতিতে শিক্ষা বিস্তার হয়েছে সেটা ভাগ্যবঞ্চিত ভারতবাসীর কাছে অসাধ্য ইন্দ্রজাল বলেই মনে হল।

জনশিক্ষার এই জাগরীশক্তি রাশিয়ায় নিজচক্ষে যাচাই করে স্বদেশের মানুষকে ডাক দিয়েছেন,—আর কোথাও নয়, রাশিয়ায় এসে একবার তোমাদের সব দেখে যাওয়া উচিত। ভারতবর্ষ থেকে অনেক চর সেখানে যায়, বিপ্লবপন্থীরাও আনাগোনা করে; কিন্তু আমার মনে হয় কিছুর জন্যে নয়, কেবল শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা করতে যাওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত দরকার।

॥ ৩ ॥

জীবনের শেষ বছরগুলি রবীন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখেছেন, ভারতবর্ষ একদিন স্বাধীন হবে, স্বাধীনভাবে দেশকে শিক্ষাদানের ভার আমাদের নিতে হবে—সেদিন শিক্ষার শক্তি স্বাধীন ভারতবর্ষ উপলব্ধি করে জনশিক্ষা প্রসারের পথে বাধা প্রাচীরগুলি ভাঙবে—আধুনিককালের নতুন শিক্ষার যে আবির্ভাব, যে শিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন, সাধারণের ঘাটে ঘাটে প্রবাহিত হবে তার ধারা—শিক্ষার কোনো বিশিষ্ট বাছাই রূপ নয় সাধারণ রূপই হবে স্বাধীন ভারত সরকারের কাম্য—দেশের শিক্ষানীতিতে শিক্ষার শক্তি নদীর মতো দেশের এক ধার দিয়ে না চলে বৃষ্টির মতো আকাশ জুড়ে নামবে—শিক্ষার দেশব্যাপী বর্ষণে সারা ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত সচেষ্ট সচেতন হয়ে উঠবে।

॥ ৪ ॥

কিন্তু স্বাধীন ভারতে যাঁরা বজ্রহাতে ইন্দ্রপদে বসে আছেন তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষা প্রত্যাশা কী নিদারুণ লজ্জায়ই না উপেক্ষিত হচ্ছে!

ভারতের লোকসভায় রাজ্যসভায় সদ্য-পাশ হওয়া শিক্ষা বিষয়ে জাতীয় নীতি কী বিসদৃশ-ভাবেই না রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তার বিরোধী!

প্রাথমিক স্তরে ভাষা-শিক্ষানীতি

[প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী অবশ্য পাঠ্য রাখার দাবীর উত্তরে]

॥ ১ ॥

সর্বস্তরে মাতৃভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম,—এবিষয়ে কারও দ্বি-মত নেই। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ভাষা বিতর্কের বিষয় এ নয়। এও উদ্ভূত বিতর্কের বিষয় নয় যে দ্বিতীয় ভাষা ইংরাজী থাকবে কি থাকবে না। ইংরেজী না থাকলে ভারতবর্ষের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যাবে বা আমাদের দেশ পেছিয়ে পড়বে একথা বিবেচকরা বলবেন না। ইংরেজী ভাষা ব্যতীত চীন, জাপান, সোভিয়েত ইউনিয়নের উন্নতি ব্যাহত হয়নি। এমন কি পশ্চিমা জ্ঞানের যা হিতকর অংশ তা এ-সব দেশে তাদের নিজ নিজ ভাষায়ই বিস্তার লাভ করেছে। বিদেশী ভাষার বাহন আর স্বদেশের উন্নতির বিষয়, দুটো একাকার করে দেখা সমীচীন নয়। কিন্তু বিবেচকরা ভাষাশিক্ষার সামগ্রিক প্রয়োজনের দিক বিচার করে এও স্বীকার করবেন, ভারতবর্ষে ইংরেজী ভাষা এখনও শিল্পের ভাষা, বাণিজ্যের ভাষা, গ্রন্থাগারের ভাষা, অনেক ক্ষেত্রে চাকরির ভাষা। যতদিন ভারতীয় একটি ভাষা ইংরেজীর স্থান গ্রহণ করতে না পারছে, ইংরেজী ভাষা-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অনবধানতা বা ভ্রূকুটি নিদারুণ ভ্রমাত্মক হবে। এই প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার ইংরেজীর সামাজিক প্রয়োজন কোনো অসতর্ক মুহূর্তেও অস্বীকার করেন নি। সকলেই চায়, **দেশের সব সন্তান ভালো করে মাতৃভাষা শিখুক এবং ভালো করে দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজী শিখুক।**

বিতর্কের বিষয় হলো, কোন্ স্তর থেকে শুরু করলে শিশু সন্তানটি ভালো করে মাতৃভাষা শিখতে পারবে এবং ভালো করে ইংরেজী শিখতে পারবে,—যাতে তার স্থায়ী লাভ ঘটবে, যাতে তার মাতৃভাষা শিক্ষা ও বিষয় শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, তার ভাষাশিক্ষার সামাজিক প্রয়োজন মিটবে। যদি শিক্ষাবিদ্‌গণ ও ভাষাবিজ্ঞানীগণ বলেন, প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার সঙ্গে

ইংরেজী শিক্ষা শুরু করলে সন্তানেরা দু'ট ভাষাই ভালো করে শিখতে পারে, তবে আমরা দাবী করবো প্রাথমিক স্তর থেকেই ইংরেজী শিক্ষা শুরু হোক। সরকারকেও আমরা এই ভাষা-শিক্ষানীতি বলবৎ রাখতেই বলবো। আর যদি তাঁরা বলেন, প্রাথমিক স্তরে কেবল একটি ভাষা মাতৃভাষা এবং মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষার সঙ্গে সযত্নে ইংরেজী শিখলেই সন্তান ভালো করে মাতৃভাষা শিখতে পারে এবং ভালো করে ইংরেজী শিখতে পারে এবং বিপরীতটা হলে সন্তানের ভাষাশিক্ষার ক্ষতি হয় তবে আমাদের দাবী হবে—প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজী ভাষা তুলে দিতেই হবে এবং এ কাজে সরকারকে এগিয়ে আসতেই হবে। অভিভাবক সন্তানকে ঘিরে স্বপ্ন দেখেন ; সন্তানের অধিকতর কল্যাণই তার কাম্য। একটা জনহিতাকাঙ্ক্ষী সরকারও ভাষাশিক্ষার স্থায়ী ফল দেশের সব স্তরের মানুষের কাছে পেঁছে দেবার কল্যাণমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করবেন।

যাঁরা ভাষানীতি, শিক্ষানীতি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন, গবেষণা করেন, কমিশন কমিটিতে পরামর্শ দেবার অধিকারী, তাঁদের অভিমত হলো, দ্বিতীয় ভাষা শেখাবার আগে মাতৃভাষায় শিশুর যথেষ্ট দখল থাকা দরকার। সেজন্য তাঁরা পরামর্শ দিয়েছেন, প্রাথমিক স্তরে শিশু কেবল মাতৃভাষা শিখবে এবং মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষার সঙ্গে দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজী শিখবে।

॥ ২ ॥

ভাষানীতি শিক্ষানীতির সোপান। শিক্ষার চলাফেরার পথ খোলসা করে দেয় ভাষা। শিক্ষা সকলকে দেব না, এই যাদের উদ্দেশ্য তারা প্রথমেই ভাষার পথ এবড়ো-খেবড়ো অব্যবহার্য করে দেবে। আর যাদের উদ্দেশ্য শিক্ষার অঙ্গনে দেশের সকল সন্তানকে প্রবেশের অধিকার ও সুযোগ করে দেওয়া এবং শিশু সন্তানের মানব ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো, তারা প্রথমেই ভাষার পথ সযত্নে তৈরি করে দেবে।

ভাষার যে সংজ্ঞার্থ আমাদের ছাত্র-পাঠ্য ব্যাকরণ বইতে দেওয়া আছে, অভিধানে যে সংজ্ঞার্থ রয়েছে, তা অনতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। ব্যাকরণ ও অভিধান বলছে—ভাষা হলো ভাবপ্রকাশের শব্দমাধ্যম ; ভাবের শাব্দিক অভিব্যক্তি হলো ভাষা। কিন্তু এ যথেষ্ট নয়। ভাষা হলো ঃ—

১। একটি চমৎকার মাধ্যম বা উপায়—

(ক) তা দিয়ে সমাজের মানুষ একে অপরের সঙ্গে কথাবার্তা চালায়।

(খ) তা দিয়ে ভাবের আদানপ্রদান করে ও একজন অপরজনকে বুঝতে পারে।

(গ) তা দিয়ে শিক্ষা সংস্কৃতি ধারণ করে, বহন করে।

২। ভাষা হলো একটি হাতিয়ার, সংগ্রামের ও সমাজ বিকাশের হাতিয়ার—

(ক) তা দিয়ে প্রকৃতির শক্তিগুলির সঙ্গে সংগ্রাম চলে।

(খ) তা দিয়ে প্রয়োজনীয় বস্তুমূল্য সৃষ্টির সংগ্রাম চলে।

(গ) তা দিয়ে সমাজের উৎপাদন ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত হওয়া যায়।

এতখানি প্রসারিত ভাষার সংজ্ঞার্থ। এতখানি গুরুত্ব রয়েছে ভাষার। সুতরাং স্বচ্ছ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভাষা-শিক্ষানীতির বিন্যাস না করতে পারলে শিক্ষার সামান্য প্রসারটুকুও ঘটতে পারবে না।

ভাষা নিয়ে যত বিরোধ তা মূলত শিক্ষা প্রসারের দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধ। যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠের সীমার মধ্যে সকলকে আনব না বলেই ভাষা-শিক্ষা নিয়ে নানা কু-ভাষা প্রয়োগ করি,—'যেমন ভাষা শ্রেণী ভাগ করে দেয়।' আদৌ সত্য নয়। শ্রেণী-ভাগ করে দেবার ক্ষমতাই ভাষার নেই। কারণ ভাষা তো সমাজের সকল শ্রেণীর মিলিত সৃষ্টি। শত শত বংশ-পরম্পরার চেষ্টার ফল। ভাষা শ্রেণী-নিরপেক্ষ। ভাষা যদি শ্রেণী ভাগ করে দিত, তাহলে সোভিয়েত রাশিয়া বা চীন পুঁজিবাদী ভিত্তি উচ্ছেদ করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব যুগের ভাষাকে উচ্ছেদ করত। কিন্তু তা আদৌ করা হয় নি। রুশ ভাষা বা চীনা ভাষার মৌলিক শব্দ-ভাণ্ডার ও ব্যাকরণ রীতিকে সমাজতান্ত্রিক কোনো শব্দ-ভাণ্ডার ও ব্যাকরণ রীতি দ্বারা স্থানচ্যুত করা হয় হয়নি। ভাষা শ্রেণী-নিরপেক্ষ বলেই ভাষা শ্রেণী ভাগ করে না। কিন্তু যে সমাজে থাকে-থাকে শ্রেণী রয়েছে সে সমাজে শ্রেণীগুলি ভাষাকে তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে। ভাষাকে ব্যবহার ক'রে অল্প কয়েকজন শিক্ষিত মানুষ

নিরক্ষর-সমস্তের ওপর আধিপত্য করেছে একথা সকলের জানা। আধিপত্যের ভাষা এ-ভাবে তৈরি করা হয়। সেটা যে কতদূর যেতে পারে তার একটা মজার উপাখ্যান পড়েছি। ইংলণ্ডে ১০৬৬-তে নর্মান বিজয় ঘটে। নর্মানরা ইংরেজদের স্থানীয় ভাষাকে ঘৃণা করত। ইংরেজরা যে ভেড়া চরাতো, সেই sheep-(ভেড়ার ইংরেজী শব্দ) যতক্ষণ চরত নর্মাণরা তাকে ইংরেজী ভাষায় sheep বলত। কিন্তু যখন sheep নর্মানদের খাদ্য হয়ে খাবার টেবিলে আসত, নর্মানরা ওকে ইংরেজী ভাষায় রেখে খেতো না! নিজেদের ভাষায় ওকে তুলে নিয়ে 'মাটন' (Mutton) বলে খেত। 'মাটন' নর্মান ব্যবহৃত ফরাসী শব্দ। বক্তব্য হলো শ্রেণী-নিরপেক্ষ ভাষাকে সমাজের অবস্থাপন্ন, সম্ভ্রান্ত শ্রেণী তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছে যুগে যুগে। সংস্কৃত ভাষাকে এ-ভাবে এক সময় এদেশে আধিপত্যের ভাষা করে ব্যবহার করা হয়েছে। ফারসী ভাষার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ইংরেজীও এদেশে আধিপত্যের ভাষা হিসেবেই ছিল, এখনও রয়েছে। —তা দেখে রবীন্দ্রনাথ ক্ষোভ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়েকজন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল ?" রবীন্দ্রনাথ যে-রায়টাকে অন্যায় ব'লে দূর করতে চেয়েছেন, সেই রায়টাকে বহাল রাখতে আজও একদল কী-ই না সংগ্রাম করছেন! পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেখছি এই রায়টাকে বহাল রাখবার ঘোর বিরুদ্ধে। আমরাও ঘোর বিরুদ্ধে। আমরা আধিপত্যের ভাষা চাই না, চাই ভাষার আধিপত্য। যে ভাষায় সাবলীলভাবে, বিনা বাধায় দেশের সাধারণ মানুষ অন্তত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠটুকু শিখে উদ্দীপিত হতে পারবে, প্রকৃতির শক্তিগুলির সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারবে, প্রয়োজনীয় বস্তুমূল্য সৃষ্টি করতে পারবে, সমাজের উৎপাদন ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত হয়ে মূলত সমাজ অগ্রগতির সঙ্গেই যুক্ত হতে পারবে। একাজে প্রতিবন্ধক হবে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে প্রথম ভাষা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ভাষাশিক্ষা অর্থাৎ এদেশে মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষা। প্রাথমিক স্তরে দুই ভাষা নীতি এক নিষ্ঠুর ঝাড়াই নীতি। অধিকাংশকে ঝাড়াই করে অল্প ক'জনকে আধিপত্য করতে দেবার নীতি। কি ভাবে এই ঝাড়াই হয়? প্রাথমিক স্তরে গ্রাম শহরের সাধারণ ঘরের শিশুছাত্র পরিবেশ বিযুক্ত ইংরেজী ভাষা শিখতে

গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। ফেলের চরায় বারবার ক্লাশ পাশের নৌকাটা আটকে আটকে পড়ে। স্কুলে পড়তে এসে ভেগে যাওয়ার যে সব কারণ রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম এই দ্বিতীয় ভাষার পাঠ—যা সে সাবলীল ভাবে শিখতে পারে না কিছুতে। আর আয়াস করে শিখতে গিয়ে গভীর বিতৃষ্ণা নিয়ে বিদ্যালয় থেকে মাঝপথে বেরিয়ে আসে। সুতরাং যদি সরকারের উদ্দেশ্য হয় অন্তত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠটুকু দেশের সকল মানুষকে দেব, তা হলে প্রাথমিক স্তরে ভাষার চলাচলের পথটা থেকে ইংরেজী ভাষার কাঁটা দূর করে শিশু ছাত্রের ছোট্ট নরম অপুষ্ট পায়ের চলার পথ খোলসা করতেই হবে। সে হবে শুভ উদ্যোগ, দরদী উদ্যোগ। কথা উঠবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ নিতে দারিদ্র্যও তো বাধা। পড়ার সীমার মধ্যে এসেও বহু শিশু দারিদ্র্যের জন্য ভেগে যায়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। জামা নেই, প্যাণ্টটা ছেঁড়া এর জন্য ভেগে যায়। সরকার পোষাক সরবরাহ করে একটা কাঁটা সরাবার যে চেষ্টা করেছেন, তা শিক্ষা দেবার ইচ্ছার পরিচয়। প্রতি গ্রামে বিদ্যালয় খুলে, টিফিন দিয়ে, বিনা-বেতন করে সকলকে শিক্ষা দেবার আন্তরিক ইচ্ছারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন সরকার। এবার প্রাথমিক স্তরে ইংরেজীকে বাধ্যতামূলক না রেখে সরকার সকলকে শিক্ষা দেবার ও ধরে রাখার শুভ ইচ্ছারই পরিচয় রাখলেন। আর মূল যে দারিদ্র্যের বাধা? তা দূর করতে সারা দেশ জুড়ে বিরাট একটি পরিবর্তন আনতে হবে। সে পরিবর্তনেই দারিদ্র্য হঠবে। আর সে পরিবর্তনের লড়াইযের জন্যই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কেবল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা সকলকে দিতে হবে। সকলের শিক্ষা ব্যতীত সকলের জন্য হিতকর সমাজ গঠন সম্ভব নয়। ভারত সরকার যে কোঠারী কমিশন গঠন করেছিল, সেই কমিশন বলেছেন, রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে হোক আর রক্তক্ষয়ী বিপ্লব ছাড়া হোক বিরাট আকারে পরিবর্তন আনতে হলে ব্যবহারযোগ্য একটিই মাত্র পথ আছে, তার নাম শিক্ষা। শিক্ষা পরিবর্তনের হাতিয়ার, আর এই পরিবর্তন মূল দারিদ্র্য দূর করবে। দারিদ্র্য দূর করবার অন্যান্য দেশের সংগ্রামে এই শিক্ষার হাতিয়ার ভালই কাজ দিয়েছে। ইচ্ছা ও নির্ভুল নীতি থাকলে ভারতের ক্ষেত্রেও এই হাতিয়ার কার্যকর হবে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাষা শিক্ষানীতিতে সকলকে শিক্ষা

দেবার এই ইচ্ছার প্রকাশ রয়েছে। বাধা দূর করতে দক্ষতা লক্ষ্য গোচর হয়েছে।

কিন্তু সকলকে শিক্ষা দেবার কথা বলতে আমি এ বলছি না, বা সরকারও নিশ্চয়ই বলবে না যে বর্তমান সমাজে সকল শ্রেণীর জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা সমান হতে পারে। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ তো সকলকে দেওয়া যেতে পারে। উচ্চ শ্রেণীকে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সেখানে নামিয়ে আনা নয়, কিন্তু মজুর, শ্রমিক, কৃষক ও গরিব খেটে খাওয়া মানুষের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আমার দেশে অনেক পূর্বেই কি করা উচিত ছিল না? সেই অবশ্য করণীয় কাজ বিলম্বে হলেও এ-রাজ্যের বর্তমান সরকার যখন করবার শুভ উদ্যোগ নিয়েছে, সে উদ্যোগে যদি প্রাথমিক স্তরে প্রথম ভাষার সঙ্গে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা ক্ষতিকর বাধা হয়, এবং ক্ষতিটা যদি পরীক্ষিত সত্য হয়, তা হলে কেন সেই প্রতিবন্ধক ইংরেজী ভাষা প্রাথমিক স্তরে রাখা হবে?

সকলেই নিষেধ করেছেন

এযাবৎ ভারতবর্ষে যতো শিক্ষা কমিশন হয়েছে, সকল কমিশনই ভাষানীতির বিন্যাস প্রসঙ্গে শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত সুচিন্তিত ও গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন। তাঁরা মতৈক্যে বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে শিশুর ভাষাপাঠ হবে কেবল মাতৃভাষার পাঠ। ভারতের দু'জন রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন ও রাধাকৃষ্ণান প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী রাখতে নিষেধ করেছেন। জাকির হোসেন কমিটি রায় দিয়েছেন প্রাথমিক স্তরে ইংরেজীকে বাদ দিতে হবে। মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার মাধ্যম। রাধাকৃষ্ণান কমিশন একই প্রতিবেদন রেখেছেন,

"During one to five grade the pupils will learn only the mother language : in grades six to eight emphasis should be on the mother tongue and the federal language." মুদালিয়র তাঁর Report of the Secondary Education Commission-এ মাধ্যমিক স্তর থেকেই ইংরেজী ভাষাকে আবশ্যিক পাঠ্য হিসেবে রাখতে বলেছেন।

১৯৫৭ সালে ভারত সরকার Official Language Commission গঠন

করেন। কমিশন তার রিপোর্টে (Report of the Official Language Commission 1957—Chairman B. G. Kher) প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী শিক্ষাদানকে অপচয় বলেছেন। কমিশনের মতে এই স্তরে ইংরেজী শিক্ষার চেষ্টায় শিশু শিক্ষার্থীর আদৌ কোনো স্থায়ী লাভ ঘটে না। অধিকন্তু ইংরেজী শিক্ষার জন্য শিশুর নিজের মাতৃভাষা ও অন্য বিষয় শিক্ষার ক্ষতি হবে। "So far the child undergoing free and compulsory elementary education in terms of Article 45 of the Constitution is concerned, it would be waste to make him undergo any instruction in the English language. Instruction in a language as totally foreign as English, for such a short period would serve no lasting purpose at all and would merely result in a curtailment of educational time avialable for other subjects and for the regional language." কমিশন সুপারিশ করেছেন, প্রয়োজনীয় ইংরেজী ভাষা-জ্ঞানের জন্য বিদ্যালয়ের শেষের পাঁচ বছর যথেষ্ট, বারো বছর বয়স পেরিয়ে শুরু হওয়া সমীচীন। "Having regard to the content and quantum of the English language which we consider indespensible for the university under-graduate and graduates we have suggested that instruction in English may start approximately at a five years for school leaving examination, that is to say, when the child has completed 12 years of age." এর ফলে কি আমরা বহির্বিশ্বের অগ্রগতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব? এই প্রশ্নের উত্তরে কমিশন জোরের সঙ্গে বলেছেন, এ ধারণা ভ্রান্ত। মাধ্যমিক স্তর থেকে ইংরেজী শুরু করলে আমাদের শিশুরা কখনো বিশ্ববিজ্ঞানের অগ্রগতি থেকে দূরে সরে যাবে না।

কোঠারী কমিশন বলেছেন, ইংরেজী শিক্ষা পঞ্চমশ্রেণী থেকে হতে পারে। কিন্তু অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষে, বিশেষ করে গ্রামের বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীর আগে শুরু নাও হতে পারে—"We have recommended that its (English) teaching may begin in Class V but we

realize that for many pupils, particularly in the rural areas, the study will not commence before VIII.” ডঃ ত্রিগুণা সেন যখন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন, তাঁর সভাপতিত্বে সংসদ সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। সেসব কমিটির প্রতিবেদনে রয়েছে শিক্ষার প্রথম উপ-বিভাগে শিক্ষার মাধ্যম হবে কেবলমাত্র একটি ভাষা। আবশ্যিকভাবে দ্বিতীয় ভাষা পড়ানো শুরু হবে পরের শিক্ষাস্তর থেকে—এই ভাষাটি সংবিধানের অষ্টম তালিকাভুক্ত ভাষা হতে পারে কিংবা ইংরেজী ভাষা অথবা অন্য কোনো ভাষা হতে পারে। শিক্ষার ওপর যে কেন্দ্রীয় পরামর্শ সমিতি গঠিত হয়েছিল তার প্রতিবেদনে রয়েছে —পঞ্চম শ্রেণীর নীচে ইংরেজী পড়ানো হবে না। এরপরে শিক্ষার কোন্ স্তর থেকে ইংরেজী চালু করা হবে তা ঠিক করবে রাজ্য সরকার। ১৯৬১-তে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা একটি সভা করে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল—ত্রিভাষা সূত্র অনুযায়ী ইংরেজী কিংবা যে কোনো একটি আধুনিক য়ুরোপীয় ভাষা মাধ্যমিক স্তরেই কেবল পঠনীয় বলে স্বীকৃত হবে। ১৯৬৪ তে ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে মতামত দেবার জন্য একটি Study group তৈরী করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরই তা করেন। এর চেয়ারম্যান ছিলেন গোকাক (বা V. K. Gokak)। তিনি ইংরেজী শিক্ষার এক ভীতিকর প্রতিবেদন রাখেন,—ভারতে ইংরেজী ভাষার জীবন এখন স্রোতের মতো। পরীক্ষার খাতায় এই স্রোতের সাক্ষাৎ মেলে। প্লেটোর শিল্পকর্মের লক্ষণের কোনো অস্তিত্ব নেই অথচ তার উল্লেখ আছে সেরকম পরীক্ষার উত্তর পত্রগুলিতে ইংরেজী ভাষার সঠিক অবয়বের সাক্ষাৎ মেলে না। একটা দুষ্টচক্র গড়ে উঠেছে—নবীন শিক্ষক ও তার ছাত্রেরা ইংরেজী বিদ্যায় সমান পারদর্শী। গোকাক এই প্রতিবেদনেই বলেন,—পঞ্চম শ্রেণীর আগে ইংরেজী পড়ানো বন্ধ করতে হবে।

ভাষা বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদরা একই ভাবে প্রাথমিক স্তরে দুটি ভাষা শেখাতে নিষেধ করেছেন। বিশ্ব রাষ্ট্র সংস্থার ইউনেস্কোর তরফ থেকে প্রাথমিক শিক্ষার উপর অনেক গবেষণা ও সমীক্ষা করা হয়েছে। Planning in the Primary school Curriculum—গ্রন্থে বলা হয়েছে প্রাথমিক

স্তরে একটি মাত্র ভাষায় সাক্ষরতা দান করা যুক্তিযুক্ত। ইংলণ্ডে রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ডঃ ডি. এ. উইলকিনস্, যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিল, প্রাদেশিক রাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগের বিদেশী ভাষা-শিক্ষা ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত অফিসার ও ভাষা সম্পর্কিত বহু গবেষণা গ্রন্থের লেখক ডঃ ফ্রাঙ্ক গ্রিটনার; হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিজ্ঞানের ভূতপূর্ব অধ্যাপক জি. বি. ক্যারোল; পশ্চিম জার্মানীর বিদেশী ভাষা শিবিরের পরিকল্পনা উপদেষ্টা; জার্মানীর স্কুলে ইংরেজী ভাষার শিক্ষক পিটার ডয়ী; আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় ভারতীয় ভাষা ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডঃ পট্টনায়ক, ফ্যাকাল্টির সদস্য ডঃ থিরুমালাই—সকলেই প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা ভিন্ন দ্বিতীয় কোনো ভাষা শিখবার পক্ষে সম্মতি দেন নি। এমনকি স্টকহম বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক স্টাফ ডরনিক, ভাষাবিদ্ জেসপারসন, ম্যাকনামারার গবেষণা পত্রধৃত গ্রন্থ সতর্ক করে দিয়ে বলেছে,—প্রাথমিক স্তরে দুটি ভাষা শিক্ষানীতি শিশু-কে নিম্নমানের শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে দেয়, শিশুর স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়, উপলব্ধির ক্ষমতা হ্রাস পায়, শব্দ-ভাণ্ডারের ওপর দখল বাড়ে না, শিশুর বিকাশের পথ বাধাপ্রাপ্ত হয়। বিষয় শিক্ষায় দক্ষ হয়ে শিশু যে কর্মজগতে, জীবন সংগ্রামের জগতে মাথা তুলে দাঁড়াবে, সে যে প্রতিযোগিতায় উপযুক্ত হবে—দ্বিভাষা শিক্ষানীতি সে পথে নিদারুণ বাধা। প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা শেখালে শিশুর অন্যান্য বিষয় শিক্ষার ক্ষমতা ও দক্ষতাই হ্রাস পায়।

শারীর বিজ্ঞানীরাও নিষেধ করেছেন

শারীর বিজ্ঞানীরাও বহু পরীক্ষা ক'রে অভিমত দিয়েছেন, প্রাথমিব স্তরে মাতৃভাষাই একমাত্র ভাষা। তাঁরা বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন, শিক্ষার ওপর স্নায়ুতন্ত্রের সম্পূর্ণ আধিপত্য রয়েছে। স্নায়ুজগৎ ভিন্ন ভাষা শিক্ষা অসম্ভব। এই স্নায়ুতন্ত্রের এলাকাগুলি খুব প্রণালীবদ্ধ, একের সঙ্গে অন্য পরস্পর জড়িত। মানব শিশুর শিক্ষায় যদি এই প্রণালী নষ্ট হয়, প্রতিবৃত্ত চক্র সৃষ্টি হতে পারে। তাতে ক'রে সুস্থ মানব তৈরি নাও হতে পারে। প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার সময় ইংরেজী ভাষা শিক্ষা চললে

এই দুর্দৈবের সম্ভাবনা রয়েছে। কীভাবে এই দুর্ঘটনা শিশু সন্তানের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে? শিশু ভাষা শেখে পরিবেশ থেকে। বাঙালী পরিবারের একটি শিশুর পরিবেশে থাকে স্বাভাবিকভাবে তার মাতৃভাষা। মা ও পরিবারের সকলে শিশুকে যখন আদর করে, ঘুমপাড়ানি গান শোনায়, তার সঙ্গে কথা বলে, এটা-ওটা দেখিয়ে চেনায়, সবই করে মাতৃভাষায়। মানবশিশুর কান দিয়ে শোনার এলাকাটি ও কথা বলার এলাকাটি খুবই কাছাকাছি। মাতৃভাষার পরিচিত ধ্বনিরাশি সংজ্ঞাবহ তন্ত্র দিয়ে শ্রবণ-নিয়ন্ত্রণ এলাকা হয়ে কথা বলার এলাকায় অনায়াসে মুদ্রিত হয়। শিশু শুনে বোঝার ও ব'লে ভাব প্রকাশের দক্ষতা অর্জন করে। শিশু যখন পড়তে শেখে তখন চোখ দিয়ে দেখা সামগ্রীর সঙ্গে কান দিয়ে শোনা কথাগুলির যোগসূত্র লেখ্য ভাষায় প্রকাশ পায়। সুতরাং বাঙালী শিশুর শিক্ষা যদি তার মাতৃভাষা দিয়ে শুরু হয় স্নায়ুতন্ত্রের এলাকায় ক্রমটি রক্ষিত হয়। তার ফলে শিশুর শিক্ষা স্নায়ুতন্ত্রের গঠনমূলক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রক্ষা করতে পারে। বাঙালী শিশুর প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রথম বিপদ, তার পরিবেশে ইংরেজী না থাকায় স্নায়ুতন্ত্রের ক্রমটি নষ্ট হয়। ইংরেজী সে প্রথমে পড়ে, লেখে তারপর বলার চেষ্টা করে। মাতৃভাষা শিক্ষার ক্রমটি ঠিক বিপরীত। প্রাথমিক স্তরে শিশুর বিভিন্ন ক্রমে শিক্ষা চললে তার মধ্যে **প্রতিবৃত্ত চক্র** সৃষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ পরিবেশ-বিযুক্ত ভিন্ন ক্রমের ইংরেজী ভাষার জন্য কথা বলার এলাকাতে নতুন করে সংজ্ঞাবহন মুদ্রিত হবে এবং উপযুক্ত ও সুষ্ঠু উত্তেজনার অভাবে প্রতিবেদন কম বা বেশী হবে। ফলে দেহ ও মনের ক্ষতি সাধিত হবে। শিশুর বিকাশ বিলম্বিত হতে পারে, শিশু জড়বুদ্ধি হতে পারে। এর থেকে রক্ষা পাবার পথ হবে যদি বাঙালী পরিবার শিশুর জন্ম থেকে পরিবারের মধ্যে এবং তার বিচরণের জগতে একটি ইংরেজী ভাষার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি ক'রে দিতে পারে। দ্বিতীয় পথ, প্রাথমিক স্তরে একমাত্র মাতৃভাষা শিক্ষা, মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষা। কারণ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুজগতের গঠনমূলক পরিবর্তন ঘটে। যোগাযোগকারী এলাকাগুলি ধাপে ধাপে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সুতরাং ১০/১১ বছর বয়স থেকে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষ এক বা ততোধিক ভাষা চাহিদানুযায়ী শিখতে পারে।

চর্চা না করলেও দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি জমা থাকবে। এ ভাবে শিক্ষাবিদ্‌রা, ভাষাবিদ্‌রা, শারীর বিজ্ঞানীরা শিক্ষাধারা, দেহমন বিশ্লেষণ করে অভিমত দিয়েছেন—প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাই একমাত্র ভাষা।

বিশেষজ্ঞদের এই সব গবেষণা থেকে শিক্ষা নিয়েই উন্নত দেশগুলি যেমন ইংলণ্ডে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, সোভিয়েত রাশিয়ায়, চীনে, জাপানে, জার্মানীতে কোথাও প্রাথমিক স্তরে প্রথম ভাষা ভিন্ন দ্বিতীয় ভাষা-শিক্ষা সরকারী শিক্ষার অন্তর্গত করা হয় নি। সোভিয়েত রাশিয়া ও চীন নিয়ে অনেক রকম কথা শোনা যাচ্ছে। ডি. সি. বিশ্বাস (D. C. Biswas) তাঁর Report on Public Education in the U. S. S. R-এ লিখেছেন —রুশ দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়গুলি আঞ্চলিক ভাষা, গণিত, অংকণ, সঙ্গীত, শরীরচর্চা, শারীরিক শ্রম, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ইতিহাস। অ-রুশ এলাকায় আঞ্চলিক ভাষা ছাড়া ছাত্রদের ইচ্ছানুসারে, ঐচ্ছিক হিসাবে সপ্তাহে বাড়তি ২ বা ৩টি ক্লাসে রুশ ভাষা পড়ানো হয়।

চীন দেশে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী বা দ্বিতীয় কোনো ভাষা পড়ানো হয় না। আর. এফ্. প্রাইস্ (R. F. Price) তার Education in Communist China গ্রন্থে লিখেছেন —চীনা গণতন্ত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছ'টি শ্রেণী। এই স্তরে প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত কোনো বিদেশী ভাষা পড়ানো হয় না। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে বিদেশী ভাষা শেখানো হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে পাঠক্রম R. F. Price উল্লেখ করেছেন তা হলো:

1. Chinese Language
2. Arithmetic
3. History
4. Geography
5. Agricultural knowledge
6. Manual Labour
7. Physical Education
8. Singing
9. Drawing
10. Weekly Assembly

এর মধ্যে ইংরেজী ভাষা বা দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার উল্লেখ নেই। দেশের হিতৈষী ব্যক্তিরাও প্রাথমিক স্তরে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা দিতে নিষেধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, জওহরলাল নেহরু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ সকলেই শিক্ষার প্রসারের পক্ষে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠটুকু দেশের সকল মানুষের কাছে পেঁৗছে দেবার ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষা যে প্রতিবন্ধক একথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে ইংরেজীর রাস্তা খুলে দিতে বলেছেন। গান্ধীজী সপ্তম শ্রেণীর আগে কোনো মতে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া অনুচিত বলেছেন। এক সময় তিনি এত বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে 'হরিজন' পত্রিকায় ১৮৮৬তে লিখেছেন—"আমি একে দ্বিতীয় ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবেও বিদ্যালয়ে স্থান দিতে চাই না—এটি থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে। মানসিক দাসত্ব থেকেই আমরা ভাবি যে ইংরাজী ছাড়া চলবে না। পরাজিতের এই মনোভাব আমার নয়।" জওহরলাল নেহরু 'হরিজন' পত্রিকায় ১৯৩৭-এ লেখেন,—"বিদেশী ভাষা এবং স্বদেশের প্রাচীন ভাষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শেখানো উচিত। কিন্তু কেবলমাত্র কিছু বিশেষ পাঠ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের জন্য প্রস্তুতি ছাড়া এগুলি আবশ্যিক ভাবে শিক্ষণীয় হবে না।"

চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই এভাবে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দিতে বারংবার নিষেধ করেছেন। বিভ্রান্ত অভিভাবকদের, বিশেষ ক'রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভ্রান্ত অংশকে বুঝে নিতে হবে—কাদের কথা শুনবেন। সন্তানের হিত চাই বলেই হিতাকাঙ্ক্ষীকে চিহ্নিত করতে হবে, ভাষাবিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে হবে।

অধিকন্তু প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী শিক্ষাদান অর্থের অপচয়

স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ সংখ্যার একটি বিশেষ প্রবন্ধে ইংরেজী ভাষার জনৈক অধ্যাপক লিখেছেন, প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী না শিখিয়ে মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী শিক্ষা শুরু করলে অর্থের অপচয় ঘটবে। "An expert language planner, however aims at maximum achievement in minimum time for as little expenditure of many as possible. What our planner does not msee to realize is that to

introduce English not earlier than the secondary stage will be false economy, because a beginner at this stage will have to work with a handicap." কিন্তু দেশের expert language planner-রা ঠিক বিপরীত কথা বলেছেন। ১৯৫৭-এ ভারত সরকার B. G. Kher-এর নেতৃত্বে একটি কমিশন বসিয়েছিলেন। সেখানে (Report of the Official Language Commission) বলা হয়েছে "So far the child undergoing free and compulsory elementary education in terms of Article 45 of the constitution is concerned, it would be waste to make him undergo any instruction in the English Language." [ভারতীয় সংবিধানের ৪৫ নং ধারা অনুযায়ী নিঃশুল্ক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ইংরেজী শিক্ষাদান অপচয় ছাড়া কিছু নয়।]

কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর ১৯৬৪তে ইংরেজী শিক্ষার ওপর যে study group গঠন করে তার চেয়ারম্যান V. K. Gokak লিখেছেন—তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজী ভাষা শেখাতে হলে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে এবং শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজন হবে তার পরিমাণ বিপুল। এর চেয়ে উচ্চ প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজী শেখার ব্যবস্থা করলে তা দেশের পক্ষে সহজ সাধ্য। "The amount of money and the number of trained teachers required to make the teaching of English possible from class III upwards would indeed be colossal. It is more easily manageable from an administrative point of view to attempt a reform in the teaching of English from the upper primary or middle school level than from the lower primary level." আর কেন্দ্রীয় ভারতীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর D. P. Pattyanayak বলেছেন—প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে দ্বিতীয় কোনো ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা খুবই খরচ সাপেক্ষ এবং গুরুভার হয়ে দাঁড়াবে। তা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বহনে সক্ষম নয়। এমনকি শিল্পোন্নত দেশগুলিতেও প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থায় একটি মাত্র ভাষাই শেখানো হয়।

ঐ অধ্যাপক যে বলেছেন মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী শুরু করলে শিশুরা ইংরেজী শিক্ষায় অসুবিধায় পড়বে—অধ্যাপকের এই মতও

বিশেষজ্ঞরা নস্যাৎ করে দিয়েছেন। পরন্তু তাঁরা দেখিয়েছেন একমাত্র মাতৃভাষায় শিক্ষা সাবলীল হলেই ইংরেজী ভালো ক'রে আয়ত্ত করা যায়। Dr. V. K. Gokak-ই বলেছেন যদি দ্বিতীয় ভাষা শেখায় কোনো সুফল পেতে হয় তাহলে মাতৃভাষায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন অগ্রাধিকার পাবে। কোঠারী কমিশনও বলেছেন, ইংরেজীর মতো একটি বিদেশী ভাষা শেখাবার আগে মাতৃভাষায় ছাত্রের যথেষ্ট দখল থাকা দরকার। পূর্বে ডঃ গ্রিটনারের কথা বলা হয়েছে, তাঁর অভিমত হলো কোনো ভাষায় নিবিড়ভাবে দক্ষতা অর্জন করতে হলে আগে মাতৃভাষায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করা দরকার —মাতৃভাষায় দক্ষতা না থাকলে বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করা সহজ হবে না। আর মাতৃভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন কবা যায় প্রাথমিক স্তবে একমাত্র প্রথম ভাষায় শিক্ষার মাধ্যমেই। সুতরাং স্টেটস্‌ম্যানের প্রবন্ধকার অধ্যাপক যে বলেছেন মাধ্যমিক স্তরে ইংবেজী শিক্ষা শুরু কবলে অসুবিধায় পড়তে হবে, এ যুক্তি কিন্তু বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের চিন্তা দ্বাবা ও তথ্য দ্বারা সমর্থিত নয়।

প্রাথমিক স্তরে কেবল মাতৃভাষায় শিক্ষা দিলে একদিকে দেশের সকল মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো সম্ভব হবে, অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর পেরিয়ে যারা মাধ্যমিক শিক্ষার সীমার মধ্যে আসবে তাদের পক্ষে দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজী শেখায় বাধা হবে না। এইক্ষণে ইংরেজীকে বর্জন করার কথা ওঠেই না এবং সরকারও বলে নি। ইংরেজীর বিকল্প দ্বিতীয় ভাষা এখনও যখন দাঁড়ায় নি, তখন চাকরির জন্য, গবেষণার জন্য, বাণিজ্যের জন্য ইংরেজী শিখতে হবে। কিন্তু দেশের সমস্ত মানুষ চাকরি করে না, বিদেশে যায় না, গবেষণা করে না। কিন্তু দেশের সমস্ত মানুষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় কেন উদ্দীপিত হবে না? প্রথাভুক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাওয়া তার অধিকার। শিক্ষা নদীর মতো গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভাগ্যমন্তের ফালি ফালি জমি উর্বর না ক'রে বৃষ্টিধারার মতো আকাশ জুড়ে নেমে গ্রাম শুদ্ধ জমি উর্বর করুক। এপথে যখন ইংরেজী বাধা তখন তাকে জোর ক'রে রেখে দেবার পেছনে কোন্ শুভ উদ্দেশ্য রয়েছে? আর যারা এই প্রাথমিক শিক্ষা পেয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সীমার মধ্যে আসতে পারবে, চাকরি করবে, প্রতিযোগিতায় নামবে, তারা তো মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী পড়ে সে পথে এগুতেই পারবে। বরং তাদের ইংরেজী ভাষার প্রয়োজন পরিপূর্ণ

ভাবে মেটানোর জন্যই ইংরেজীকে মাধ্যমিক শ্রেণী থেকে যত্ন নিয়ে শুরু করা বাঞ্ছনীয়। সকল বিশেষজ্ঞই বলেছেন, মাতৃভাষায় সাবলীলভাবে দক্ষতা অর্জন করতে পারলেই বিদেশী ভাষা ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করা সহজ হবে। অন্যথায় সন্তান না শিখবে মাতৃভাষা না শিখবে ইংরেজী। ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন অসম্পূর্ণ থেকে তার শিক্ষা লাভ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং একথা কি জোর দিয়ে বলা যায় না যে,—

(১) দেশের সকল মানুষকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠটুকু দেবার জন্য শিক্ষার চলাচলের পথ থেকে ইংরেজীকে সরিয়ে দেওয়া এবং প্রথম ভাষা মাতৃভাষাকে অনন্য করে রাখাই প্রাথমিক স্তরে শিক্ষানীতির ও ভাষা শিক্ষা-নীতির স্বচ্ছ ও পরীক্ষিত সঠিক পদক্ষেপ হবে ?

(২) ইংরেজীকে অল্প কয়েকজনের আধিপত্যের ভাষা করে না রাখার জনাই, পরন্তু যারা প্রাথমিক শিক্ষা পেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার সীমার মধ্যে আসতে পারবে তাদের সকলকে ভালো করে মাতৃভাষা ও ভালো করে ইংরেজী শেখাবার জন্যই ইংরেজীকে মাধ্যমিক স্তর থেকে শেখানোই সঠিক হবে ?

সকলকে শিক্ষার সীমার মধ্যে আনার ভয় রয়েছে

প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী শিক্ষার এই গভীর ক্ষতির কথা, অর্থনৈতিক অপচয়ের কথা শুনেও যারা জোর ক'রে ইংরেজী রাখার পক্ষে বলবেন, তাদের উদ্যোগ দেশের সন্তানদের সঠিক শিক্ষার প্রয়োজনের পথে প্রতিবন্ধক বলে আমার মনে হচ্ছে। ইংরেজীর কাঁটা পুঁতে বহু সন্তানকে ভাগিয়ে দেওয়া তাদের লক্ষ্য বলে বোধ হচ্ছে। উদ্দেশ্যহীন কার্য তো হয় না। আর সে কার্য যদি আন্দোলন হয়, তবে তা ছেলেখেলা হবেই না। এ বিষয়েও শিক্ষাব্রতী, হিতাকাঙ্ক্ষী, সমাজবিজ্ঞানী ব্যক্তিরা দেখিয়েছেন,—চিরকালই দেশের সকলের শিক্ষার প্রয়োজন মেটানোর, ভাষার প্রয়োজন মেটানোর কথা যখনই উঠেছে, একদলের ভয়ের প্রশ্নও উঠেছে। ভয়টা দেশে দেশে এক রকম নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশে শিক্ষার প্রসারে কোনো ভয়ই নেই। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে শিক্ষা দেবার ওজনদণ্ড রয়েছে। তারা ততটুকু শিক্ষার সুযোগ দেবে যতটুকু তাদের নিজের স্বার্থে প্রয়োজন।

উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রগতির জন্য শিক্ষা তারা দিয়েছে। তারা দেখেছে অশিক্ষা শিল্পোন্নয়নে বাধা দেয়। কিন্তু স্বার্থের প্রয়োজনের বাইরে তারা যাবে না। ইংরেজ তার নিজের দেশে এই সামান্য শিক্ষা যখন দিয়েছে, তখন আমাদের দেশে শিক্ষা দিতে সে নারাজ হয়েছে। তার কারণ সে তার স্বার্থের প্রয়োজন ভেবেছে। তাদের প্রয়োজন ছিল নবগঠিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে চালাবার জন্য ইংরেজী শিক্ষিত একটা দোভাষী শ্রেণীর। তখনই তারা বিপুল অর্থ ব্যয় করে এই শ্রেণীটাকে শিক্ষা দিয়ে তাদের স্নেহান্বিত অংশ করে তৈরি করেছে। কিন্তু দেশের সকলকে যে শিক্ষা দিতে চায় নি, তার কারণ তাদের ভয় ছিল তাদের স্বার্থ বিপন্ন হতে পারে। কিন্তু দেশের মানুষের চাপ ছিল, ক্রমোত্তর চাপ। দেশের হিতাকাঙ্ক্ষীরা বুঝেছিলেন শিক্ষা না পেলে দেশের মানুষ স্বাধীনতার মর্ম বুঝবেন না, তাদের প্রচারে বাধা হবে। দেশের মানুষকে জাগ্রত করবার এক শুভ নৈতিক দায়িত্ব তাঁরা বোধ করেছিলেন। আর দেশের শিল্পোন্নয়নের স্বার্থের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তারাও বুঝেছিলেন অশিক্ষা শিল্পোন্নয়নে বড় বাধা। এই সব চাপের কাছে ইংরেজকে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। ১৯২৬-এ বাংলাদেশের আইন সভায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব (যা গোখ্‌লে ১৯১০-এ রেখেছিলেন) আনতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ অনিচ্ছা থেকে আন্দোলনেরচাপে তা করেছে বলে তার বিরুদ্ধে দোভাষী শ্রেণীর স্নেহান্বিত অংশকে উস্‌কে দিয়েছিল। গোখ্‌লের প্রস্তাবের বিরোধিতা যে হয়েছিল, এবং বাংলাপ্রদেশের বুদ্ধিজীবীরা যে সবচেয়ে জোর বাধা দিয়েছিল, তা এরই ফলে। এরা বুঝেছিল শিক্ষাকে চড়া দরে কিনবার সামগ্রী ক'রে রাখতে পারলেই মান পাওয়া যাবে, অর্থ পাওয়া যাবে, আধিপত্য করা যাবে। এই সার কথাটা বুঝে তারা সেদিন যেমন বিরুদ্ধতা করতে নেমে পড়েছিল, সেভাবে আজও এরা বুঝল যে শিক্ষাকে সকলের কাছে সুলভ করে দিলে অর্থে-মানে-সৌভাগ্যে-আধিপত্যে ভাগ বসানোর সংখ্যা বাড়বে। অভিজ্ঞতায় দেখছি আজ ভাগ বসাতে দেব না বলে যারা গর্জন ক'রে পথে নেমেছেন তাদের অনেকেই মধ্যবিত্ত মানুষ। তারা হারাবার ভয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু তারা ভেবে দেখছেন না সৌভাগ্যের সুযোগকেই যে অল্প করে রাখা হয়েছে। অথচ পেছনের ভাঁড়ারে অনেক সুযোগ তালাচাবি

দিয়ে বন্ধ আছে। তাকে যদি সামনে আনতে হয় তবে যাদের শিক্ষা থেকে বিতাড়িত করছি তাদের সাহায্যে শিক্ষার সঠিক চাবি দিয়েই সে তালা খুলতে হবে। মধ্যবিত্তদের বিভ্রান্ত অংশকে এ সত্য বুঝতে হবে।

অবশ্যই তালাদাররা তখন নতুন পথ নেবে। কারণ শিক্ষায় সকলকে উদ্দীপিত ক'রে তোলার বিপদ আছে। সে যদি পশ্চিমবঙ্গ হয় তা হলে বিপদ আরও সমূহ। ভারতের অন্যান্য অনেক প্রদেশে যখন ষষ্ঠশ্রেণী থেকে ইংরেজী চালু ক'রে প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার নীতি গ্রহণ করা হল, তখন যে তালাদাররা সে সব রাজ্যে এ রকম আন্দোলনকে মদত দিল না, আর বাংলায় দিল, তার কারণ পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে তাদের ভাবনা বিশ্লেষণ ভিন্নরকম। বর্তমানে এই প্রদেশের বামপন্থী সরকারটা সম্পর্কে তাদের রাজনীতিক বিশ্লেষণ আছে। শিক্ষানীতি ও ভাষানীতির ঘাড়ে সেই রাজনীতিক বিশ্লেষণ চাপিয়ে দিয়েছে। তার থেকে ঐ আন্দোলনের একটা দিক খুলে দিয়েছে। আর একটা দূরপ্রসারী বিশ্লেষণ রয়েছে। সে বিশ্লেষণ ক'রে ইংরেজও এদেশে সকলকে শিক্ষা দিতে চায় নি। তাদের ভয় ছিল গ্রামের সাধারণ মানুষ যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামান্য শিক্ষাটুকু পেয়ে উদ্দীপিত হয়, তবে শহরের মধ্যবিত্তের ভালো অংশ, বিপ্লবী অংশ যে প্রচারপত্র বিলি করবে তা গ্রামের মানুষ পড়তে পেরে জাগ্রত হবে। এই দুই অংশ যদি একটা সেতুর ওপর এসে দাঁড়ায়, ইংরেজের সিংহাসন টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে। বৃটিশ অফিসার হার্টগ সে কথাই বলেছিলেন, "জনসাধারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা কি করতে যাচ্ছে? সহজে প্রভাবিত ও বিচলিত হয় এমন এক জাতিকে কি আরও প্রভাবিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত করবে?" ব্রিস্ সাহেব প্রাথমিক শিক্ষার ওপর যে রিপোর্ট ১৯২১-এর ৩১ মার্চ দাখিল করেন, সেখানেও তিনি সকলের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের বিরোধিতা করেন। তার বক্তব্যের অন্যতম ছিল—যদি চাষী পড়তে আরম্ভ করে ও ভাবতে আরম্ভ করে তা হলে নীতিহীন প্রচারকের পাল্লায় পড়বে। বিক্ষুব্ধ মধ্যবিত্তের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ প্রোলিটারিয়েটকে যুক্ত করা বাস্তবিক নির্বুদ্ধিতা।' পড়তে পারলে চোখ খুলে যাবে, দারিদ্র্য বেশী উপলব্ধি করবে এবং তা দূরীকরণের জন্য সংগ্রাম শুরু করবে। এ কথাই কংগ্রেসের জমিদার অংশ বেঙ্গল রুরাল প্রাইমারী এডুকেশন বিল আলোচনার সময় বিলের প্রতিবাদ

করে বলেন—গ্রামের মানুষের বুদ্ধিকে উদ্দীপিত করার প্রয়োজন নাই—"It is not necessary to accentuate the intelligence of the rural people." শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন তালাদাররা বোধ করে। কিন্তু প্রদেশ বুঝে তাদের চিন্তা ভিন্ন। সন্তানদের পরিবেশে না থাকা এই ইংরেজীকে প্রাথমিক স্তরে অবশ্য পাঠ্য রেখে যদি বহু সন্তানকে বিদ্যালয় থেকে ভাগিয়ে দেওয়া যায়। প্রদেশ বুঝে তারা একে কাজে লাগাবেই।

তবুও কিন্তু দেশের হিতাকাঙ্ক্ষীরা বিরামহীন ভাবে সকলের জন্য শিক্ষার ক্রমোত্তর চাপ দিয়ে যাচ্ছেন। সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, কৃষক সমিতি ইত্যাদি থেকে দাবী উঠছিল। তারাই দাবী তুলেছিলেন শিক্ষার পথকে বিজ্ঞান-সম্মত করবার জন্য ভাষা শিক্ষানীতিকে বিন্যস্ত করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার গণমুখী শিক্ষার এই দাবীকে সরকারের গণমুখী শিক্ষা প্রসারের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমর্থন ক'রে ভাষা শিক্ষানীতিকে বিন্যস্ত করেছে।

দেশের সকলের মাতৃভাষার প্রয়োজন পরিপূর্ণভাবে মিটুক। যারা এই প্রাথমিক শিক্ষা পেয়ে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার সীমার মধ্যে আসবে তাদের দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন পরিপূর্ণ ভাবে মিটুক। দেশের সন্তানদের পরিপূর্ণ ভাষা শিক্ষার জন্যই প্রাথমিক স্তরে কেবল মাতৃভাষা এবং মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাই সঠিক। এই ব্যবস্থাই মানবিক, নৈতিক, বিজ্ঞাননিষ্ঠ; সুতরাং দেশের ভবিষ্যৎ-সম্পদ সন্তানদের পক্ষে মঙ্গলজনক।

———

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ও জাতীয় শিক্ষানীতি

রবীন্দ্রনাথ আমাদের গৌরবী ঐতিহ্য। রবীন্দ্র ঐতিহ্যের অর্থ তাঁর সৃষ্টিকর্ম কী পরিমাণ বর্তমানের সেবা করতে সক্ষম, তার পরিমাপ করা। এই সেবাযোগ্যতা যেদিন রবীন্দ্রনাথ হারাবেন, সেদিন তিনি ঐতিহ্য না হয়ে অতীতের মূল্যবান সামগ্রীতে পরিণত হবেন। কিন্তু আজও তিনি সে সেবাযোগ্যতা হারান নি বলেই রবীন্দ্র-শিক্ষাচিন্তার আলোকে ভারতের নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির স্বরূপ বিচার করা যাবে।

সন্তানের পক্ষে, সমাজ ও দেশের পক্ষে শিক্ষার একটা যুগান্তকারী হিতকরতার ভূমিকা রয়েছে। রবীন্দ্রশিক্ষা চিন্তা এই কল্যাণকরতা পরিমাপক যন্ত্রস্বরূপ। রবীন্দ্র-শিক্ষাচিন্তা প্রয়োগ করে কোনো শিক্ষানীতি ও শিক্ষা-বিধির ভেতরটা দেখা যাবে এবং সহজে বিচার করে দেখানো যাবে উক্ত শিক্ষাচিন্তা ও শিক্ষাপ্রণালী সন্তান ও দেশের পক্ষে হিতকর, কি ক্ষতিকর। লোকসভায় ও রাজ্যসভায় সদ্য পাশ হওয়া শিক্ষা বিষয়ে জাতীয় নীতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তা প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে।

প্রথম প্রয়োগ : বড়ো আইডিয়া ও তার রূপায়ণ

বড়ো একটা আইডিয়া ও তার রূপায়ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটা বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তিনি মনে করতেন : আইডিয়া যত বড়োই হউক, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা ক্ষুদ্র হউক, দীন হউক, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে চলিবে না। [ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ] যেখানেই লঙ্ঘন করা হয়েছে, আইডিয়া 'ধ্যান করা নেশা করা মাত্র' হয়ে উঠেছে। এই প্রাজ্ঞ উপলব্ধি প্রয়োগ করে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির স্বরূপ বিচার করা যাবে। মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক এপ্রিল, ১৯৬১-র উপস্থাপনায়—National Policy on Education presentation—শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা খুবই বড়ো আইডিয়া, অতিসুন্দর সংকল্প,

উজ্জ্বল সদিচ্ছা। যেমন সকলের জন্য শিক্ষার কথা, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, জাতীয় ঐক্য ইত্যাদি বড়ো সব আইডিয়া রয়েছে—National cohesion, scientific temper and independence of mind and spirit thus furthering the goals of socialism, secularism and democracy [ch 2.5] এসব উদ্দেশ্য ঠিকই আছে। এ নিয়ে কারও মতভেদ নেই, কেউ বিতর্ক করবেন না। এসব আইডিয়া কার্যকর করা হলে সন্তান বর্তমান যুগের শিক্ষার অন্নবস্ত্রে মানুষ হয়ে উঠবে। দলমত নির্বিশেষে দেশবাসী মাত্রই আমরা তা চাই। কিন্তু এই সব উজ্জ্বল আইডিয়াকে রূপায়িত করা যাবে কী উপায়ে—শিক্ষা বিষয়ে জাতীয় নীতিতে তা বাস্তবিকভাবে ও সুনির্দিষ্টরূপে দেখানো হলো না। তার কোনো উপলব্ধিই সরকারের আছে বলে নিশ্চিন্ত হতে পারা গেল না। একটা উদাহরণ দেখা যাক।

আমাদের শিক্ষানীতিতে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের সদিচ্ছা আছে। শিক্ষা-ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের আইডিয়াটা কি? কীভাবে এই আইডিয়াকে বাস্তবে রূপ দেওয়া হয়? সমাজতান্ত্রিক আইডিয়া হলো এই সুন্দর উপলব্ধি যে, শিক্ষার যাবতীয় সুফলকে দেশের সকল মানুষের কাছে সহজপ্রাপ্য করা হবে। নিশ্বাস বায়ুর মতো শিক্ষা হবে সহজলভ্য। বিদ্যালয়ে যাবার বয়স হয়েছে এমন একটি শিশুও বিদ্যালয়ের অঙ্গনের বাইরে থাকবে না। "Education is as natural to them as the air they breathe." "Not a single child of school age stays outside school in the socialist Countries".

People's well being in Socialist soceity-

শিক্ষার আলো একাংশের ওপর পড়বে, আরেক অংশে লাগবে পূর্ণ গ্রহণ —সে তো জাতির জীবনে আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপ। অগ্রসর শিক্ষা দিয়ে জনগণের শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান চেতনার মান নিরন্তর উন্নত করা হবে। এই পথেই দেশের জনগণ তাদের প্রতিভা ও দক্ষতাকে উৎকর্ষে বিকশিত করতে পারবে। কোন্ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে সমাজতান্ত্রিক দেশ এই বড়ো আইডিয়াকে কার্যে রূপ দিতে পেরেছে? সে হলো, শিক্ষার

লক্ষ্যকে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন কাঠামো, উৎপাদন পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক দ্রুত উন্নয়নের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করে দিয়ে। রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার আইডিয়ার এই উপলব্ধি ও তার রূপায়ণের এই কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন।

বর্বর জার্মান নাজি আক্রমণ চারটা বছর ধরে (১৯৪১-৪৫) সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থাকে তছনছ করেছে, দেড়কোটি ছাত্রের ৮২ হাজার স্কুল ধ্বংস করেছে, ৩৩৪ টি উচ্চশিক্ষাকেন্দ্র পুড়িয়ে দিয়েছে, অগণিত শিক্ষক ও হাজার হাজার ছাত্রকে হত্যা করেছে। এই মরুধ্বংসস্তূপ সরিয়ে পরবর্তী দুই দশকের মাথায় ১৯৭০ সালের মধ্যে সে দেশ আবার সকলকে শিক্ষার সীমার মধ্যে এনেছে, শিক্ষিতের হার তুলেছে পুরুষের মধ্যে ৯৯'৮ শতাংশ, নারীদের মধ্যে ৯৯'৭ শতাংশ। এই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছে শিক্ষার মহৎ আইডিয়াকে বাস্তবে রূপ দেবার নির্দিষ্ট অর্থনীতির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেই। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন বড়ো আইডিয়া ও তার রূপায়ণের মধ্যে সর্বদা এই নিবিড় প্রকল্প দরকার।

কিন্তু আমাদের এই সদ্যপাশ হওয়া শিক্ষা বিষয়ে জাতীয় নীতিতে সমাজতন্ত্রের কথা বলা হলো, অথচ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি দূরের কথা উৎপাদন কাঠামো ও পরিকল্পনায় সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যকে যুক্ত করে দেবার কোনো সুনির্দিষ্ট কথা কোথাও বলা হলো না। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য লেখা হলো অথচ শিক্ষাকে সকল দেশবাসীর কাছে সহজপ্রাপ্য করার ও জনগণের শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান চেতনার মান উন্নত করার কোনো নিশ্চয়তা দেওয়া হলো না। সকলের জন্য শিক্ষা ['Our national objective is that education should mean education for all'] ঘোষণা করা হলো, কিন্তু কীভাবে ভারতের সকল ঘরে শিক্ষার ফসল উঠবে তার নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা রাখা হলো না। শিক্ষা ব্যবস্থাকে পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করা হলো—'The main task is to strengthen the base of the pyramid, which might touch billian at the turn of the century. Equally important is to see that those at the top of the pyramid are among the best in the world.' [ch. 9.2] লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসীর বসতি জুড়ে বিস্তৃত পিরামিডের গোড়াটা মজবুত করার কথা বলা হলো

কিন্তু কীভাবে তা করা হবে, বলা হলো না, এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দ হলো না, পরিকল্পনা হলো না। সে দায়িত্ব ভবিষ্যতের কাছে রেখে বলা হলো শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের উত্তর রাষ্ট্রকেই খুঁজে বার করতে হবে—'As in the case of other areas of development, the Natoinal has to find its own answers to the problems afflicting Educations. [ch. 9] কিন্তু বড়োই আশ্চর্যের, পিরামিডের শিখরে যারা থাকবে তাদের দুনিয়ার সেরা সন্তানদের সমকক্ষ করে তোলার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হলো এবং কীভাবে সে পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া যায় তার জন্য ছক কাটা, অর্থ বরাদ্দ সব করা হলো। অবৈতনিক ও আবাসিক আদর্শ নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন করে এই আইডিয়া সফল করতে সরকার এতো উৎসাহী হলো যে শিক্ষার দলিল লোকসভায় পেশ করার আগেই এ বিষয়ে কাজ শুরু করে দিল। এ ঘটনা সমাজতান্ত্রিক উপলব্ধি নয়, সমাজতান্ত্রিক আইডিয়ার ঘোর বিপরীত। অথচ শিক্ষানীতিতে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য, সকলকে শিক্ষা দেবার লক্ষ্য—এসব আইডিয়া রাখা হলো। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার বিচারে এরূপ আইডিয়া হলো ওপর সাজ, ওপর চাল, কথার কথা—সমাজতন্ত্রের ধ্যান ও নেশা, স্বদেশবাসীর সঙ্গে ছলনা। এ হলো শিক্ষার অসাম্য, শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো জাতিভেদ, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা। এর ফল বিষময়।

দ্বিতীয়বার প্রয়োগ ঃ শিক্ষার বিস্তার

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরে শিক্ষার বিস্তারের পক্ষে বলে গিয়েছেন। শিক্ষার প্রসঙ্গ উঠলেই, কখনও প্রসঙ্গ টেনে এনে বারংবার বলেছেন ঃ আধুনিক কালের নতুন শিক্ষার যে আবির্ভাব তার প্রবাহ যেন সর্বজনীন দেশের অভিমুখে বইতে থাকে ; সাধারণের ঘাটে ঘাটে যেন প্রবাহিত হয় সে ধারা। মৃত্যুর একবছর আগেও ১৯৪০ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে ভাষণ দিয়েছেন ঃ 'যে শিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন…সমস্ত দেশের মধ্যে তার ধারাকে প্রবাহিত করতে হবে।' 'বিদ্যা মনুষ্যত্ব লাভের উপায়।' 'বিদ্যালাভে মানবমাত্রেরই সহজাত অধিকার।' [স্ত্রীশিক্ষা] পরাধীন দেশের শিক্ষা সংকোচনের মুখে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ দাবি করেছেন,

বিদ্যার প্রসারে যে প্রাচীর বাধা রয়েছে তা ভাঙতে হবে। 'যেমন করিয়া হউক আমাদের দেশে বিদ্যাক্ষেত্রকে প্রাচীরমুক্ত করিতে হইবে।...স্বাধীনভাবে দেশকে শিক্ষাদানের ভার আমাদের নিজেকে লইতে হইবে।' [শিক্ষাবিধি] রাশিয়া ভ্রমণমকালে তিনি লক্ষ্য করেছেন, রাশিয়ার শ্রীবৃদ্ধি ও শক্তি নিহিত রয়েছে প্রাচীর ভেঙে সকলের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের কর্মকান্ডের মধ্যে। নিবিড় আবেগে রাশিয়ার চিঠিতে লিখেছেন: আমি স্বপ্ন দেখি সেই দিনটির যেদিন আর্যসভ্যতার ঐ প্রাচীন ভূমির (ভারতবর্ষের) সব মানুষ শিক্ষা ও সাম্যের মহাশীর্বাদ লাভ করবেন। কবি বিশ্বাস করতেন: 'অশিক্ষায় মন জড়তাপ্রাপ্ত হয়, প্রবঞ্চিত, পীড়িত হয়'। শিক্ষার মহাশীর্বাদ পেলে ভারতের 'যুগ যুগ ধরে শৃঙ্খলিত গণমানসের মুক্তি' ঘটবে; দেশবাসীর অবিদ্যা দূর হবে, চিত্তে আলো আসবে, নিজের ওপর স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধা জাগবে, আত্মবিশ্বাস আসবে। এই জন্যই শিক্ষা সকলের কাছে পেঁাছে দিতে হবে। সাম্প্রদায়িক হানাহানির অন্যতম কারণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন অশিক্ষার আত্মগ্লানিকে। 'আজ হিন্দু-মুসলমানে যে একটা লজ্জাজনক আড়াআড়ি দেশকে আত্মঘাতে প্রবৃত্ত করছে তার মূলেও আছে সর্বদেশব্যাপী অবুদ্ধি। অলক্ষ্মী এই অশিক্ষিত অবুদ্ধির সাহায্যেই আমাদের ভাগ্যের ভিত্তি ভাঙবার কাজে চর লাগিয়েছে; আত্মীয়কে তুলেছে শত্রু করে, বিধাতাকে করছে আমাদের বিপক্ষে। (শিক্ষার বিকিরণ)

শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনার আলোকে নয়াশিক্ষানীতির শিক্ষাবিস্তারের আইডিয়া কতদূর আন্তরিক ও বাস্তবিক, বিচার করা যেতে পারে। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে শিক্ষাদানের ভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করার সুযোগ যখন এলো, শিক্ষার প্রসারের পথে প্রাচীর বাঁধাটা ভাঙার কাজে সঠিক আগ্রহে সেদিন কংগ্রেস সরকার রাজ্যে রাজ্যে হাত দিলেন না। সংবিধানে যদিও সংকল্প লিপিবদ্ধ হলো যে ১৯৬০ সালের মধ্যে দেশের সন্তানদের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক সর্বজনীন শিক্ষা দেওয়া হবে, কিন্তু সে বড়ো আইডিয়াটা আজ পর্যন্ত ধ্যানের বস্তু হয়ে রইল। যথার্থ ইচ্ছা ও উদ্যোগের অভাবে বিদ্যার জমিতে নিরক্ষরতা আগাছার মতো বাড়তেই লাগল। বাড়তে বাড়তে এখন দাঁড়িয়েছে ৪৪ কোটিতে, একবিংশ শতকের আরম্ভ বছরে সে সংখ্যা দাঁড়াবে ৫০ কোটিতে। ৫০ কোটির

এই সংখ্যাতত্ত্ব নতুন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং দিয়েছেন। ১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে নয়া শিক্ষানীতির দলিল রাখার সময় এই তথ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছিলেন ১৯৬১ সালের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সীমার মধ্যে সকল সন্তানকে আনা হবেই। ৪০ বছরের সুদীর্ঘ বিলম্ব সত্ত্বেও দেশবাসী উৎসাহিত হয়েছিলেন। কিন্তু পাঁচমাসের মাথায় ১৯৬১-র জানুয়ারি মাসে নতুন শিক্ষানীতির দ্বিতীয় দলিল রাখার সময় আরও পাঁচ বছর চেয়ে নিয়ে সুপারিশ করা হলো মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করা হবে। দেশবাসী ক্ষুণ্ণ হলেন, সন্দিহান হলেন। তিন মাসের মাথায় যে দলিল লোকসভায় পেশ করে পাশ করিয়ে নেয়া হল, সেখানে দেখা গেল ১৯৬১ সালের বছরের সীমাটাও তুলে দেওয়া হয়েছে। সর্বজনীন শিক্ষা দেবার কোনো নির্দিষ্ট তারিখ, বছরের উল্লেখই করা হলো না।

আজ থেকে ৭১ বছর আগে মহাত্মা গোখ্‌লের সর্বজনীন শিক্ষার প্রস্তাব দেশের নেতৃত্বের হাতে প্রত্যাখ্যাত হতে দেখে রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হয়েছিলেন। এত বছর পর স্বাধীন ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতিতে সে উদ্যোগে উপেক্ষা দেখে দেশবাসীর মনে সন্দেহ জাগছে—বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীর মুক্ত করতে এবং শিক্ষার ধারাকে সর্বজনমুখী করতে স্বদেশের কেন্দ্রীয় সরকার আদৌ আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক কিনা। অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ডের যে কথা জাতীয় শিক্ষানীতিতে রয়েছে তাও আন্তরিকভাবে রূপায়ণের প্রয়াস নেই। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে ৫০·৫ শতাংশ এবং মাধ্যমিক স্তরে ৭২·১ শতাংশ ছাত্রছাত্রী যে লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছে, তা রোধের ক্ষেত্রে প্রকৃত উদ্যোগ নেই। শিক্ষা খাতে অর্থবরাদ্ধ দশ শতাংশ দূরের কথা তা ক্রমহ্রাসমান হয়ে এক/দুই শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার জন্য ব্যয়কে অনুৎপাদক মনে করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থের অভাবের কথা যদি তোলা হয়, বলতেই হবে শিক্ষার দানে মানবসম্পদ উন্নয়ন করতে দিতেই হবে। কারণ শিক্ষার দেশব্যাপী বর্ষণে দেশের অগ্রগতির শিকড়ে রস জোগানো যায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এই অর্থাভাব কখনওই নেই। দেশের ধনীজনকে একাধিক তিনটি কর ছাড় দিয়ে (সম্পদ কর, ভূ-সম্পত্তি কর, আয়করের হার হ্রাস) সরকার বছরে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা হারাচ্ছেন। অপরদিকে রাষ্ট্রের

অর্থভাণ্ডার থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিবছর বৃহৎ রপ্তানীকারীদের ভর্তুকি দিতে প্রায় আরেক হাজার কোটি টাকা সরকার হারাচ্ছেন। শতকরা এক জনের কম দেশবাসীর জন্য আদর্শ স্কুলের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫00 কোটি টাকা। এই আড়াই হাজার কোটি টাকার অর্ধেক ভাগ ব্যয়ে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করার সর্বাগ্রে করণীয় কাজ সম্পাদন করলে দেশের ভাণ্ডারে মহার্ঘ সম্পদ তোলা সম্ভব হতো। অর্থের অভাব নেই, অভাব রয়েছে সকলকে শিক্ষা দেবার দৃষ্টিভঙ্গির এবং তাকে কার্যকর করার বাস্তবিক পরিকল্পনার।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করার পরিকল্পনা থাকলে শিক্ষার প্রাচীর বাধাটা ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া এতদিনে যেতই। সে লক্ষ্য না থাকলে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক কোনো দিন সর্বজনীন শিক্ষাদানের কোনো নির্দিষ্ট বছর ধার্য করতে পারবে না। দেশের সন্তানরা শিক্ষার মহাশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হতেই থাকবে। করণীয় কাজে হস্তক্ষেপ না করে কেন্দ্রীয় সরকার এক্ষেত্রে যা করছে তা হলো কেবল বাধার প্রাচীরটা যাতে চোখে না পড়ে, সেজন্য প্রাচীরটাকে একটা বিশাল দামী ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেবার ব্যবস্থা। এই ত্রিপলটি হলো প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার ত্রিপল। প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা দেবার উদ্যোগ ও ব্যবস্থা শিক্ষার হিতকর বিস্তারের ব্যবস্থা নয়। নির্দিষ্ট কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ সময়ের জন্য প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা ব্যবস্থা ভাল কাজ দিলেও, স্কুল শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে এ ব্যবস্থা কখনও কল্যাণপ্রদ হবে না। সে হবে স্কুলশিক্ষার অঙ্গনে সকল শিশুর প্রবেশের সুযোগদানের অক্ষমতাকে আড়াল করার ব্যবস্থা। স্কুল ব্যবস্থায় শিক্ষালাভের অধিকার শিশুর জন্মগত অধিকার। শিক্ষার সে সুযোগ এতে প্রসারিত না হয়ে সংকুচিত হবে। এক অংশ শিশুসন্তান স্কুলশিক্ষার সুযোগ পেল, আরেক বৃহত্তর অংশের শিশু তা থেকে বঞ্চিত রইল। প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়ে, উৎসাহমূলক বিভিন্ন পরিকল্পনার সাহায্যে এদের স্কুলের দিকে টেনে আনার চেষ্টা না করে এবং পড়া ছেড়ে চলে যাওয়ার পথটা সিমেন্ট করে বন্ধ করার পরিকল্পনা না করে ঠেলে দেয়া হবে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে। এর ফলে শিক্ষা বিস্তারের প্রাচীর বাধাটা নতুন এক বিদ্বেষবাধার রূপ নিয়ে সামনে দাঁড়াবে। স্বজাতি

শিক্ষাকামী সন্তানের মধ্যে বিচ্ছেদের বিষবৃক্ষ উপ্ত হবে। পর্যাপ্ত বিদ্যালয় খুলে সকলকে শিক্ষা দেবো না বলেই যদি এই সব পরিকল্পনা হয়ে থাকে, এই উদ্যোগের মধ্যে সেই অনিচ্ছা ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ এরূপ অনিচ্ছার মূল খুঁজতে গিয়ে টলস্টয়ের একটা উদ্ধৃতিকে সমর্থন করে বলেছেন, সরকার জনগণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার চায় না, কারণ জনগণের অশিক্ষা অজ্ঞতার মধ্যে সরকারের শক্তি রয়েছে নিহিত—'The strength of the government lies in the people's ignorance and the government knows this and will therefore always oppose true enlightenment.' (শিক্ষা সংস্কার)। রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধিতে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বিচার করলে সন্দেহ হবেই যে কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে দেশের জনগণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার না ঘটুক। শিক্ষা চেতনা আনে, চেতনা আনে সংগঠন, সংগঠন আনে বিপ্লব—শিক্ষার এই ক্রমোত্তরণের জাগরী শক্তির ভয় রয়েছে সরকারের। এজন্য অশিক্ষার প্রবল মারের সঙ্গে যেটুকু শিক্ষাও দেওয়া হচ্ছে সেখানেও কুসংস্কারের মার, অজ্ঞতা, মূল্যবোধহীনতা, কুশিক্ষার মারের শক্তি রাখা হলো। দলমত নির্বিশেষে সন্তান-হিতাকাঙ্ক্ষী স্বদেশবাসী অভিভাবক ও আত্মহিতকামী সন্তান মাত্রেই এই ঘটনায় গভীর উদ্বিগ্ন হবেন।

তৃতীয়বার প্রয়োগ : উচ্চবর্গীয় শিক্ষা :

শিক্ষার উচ্চবর্গীয় চরিত্রের বিরোধিতা রবীন্দ্রনাথ বরাবর করেছেন। মুষ্টিমেয় ভারতবাসী রায় দেবে আর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবাসী তা 'জো হুজুর' বলে মাথা পেতে নেবে—এই বিধির শিক্ষার তিনি বিরুদ্ধে ছিলেন। বিভিন্ন প্রসঙ্গে, বিভিন্ন লেখায় শিক্ষার এই উচ্চবর্গীয় চরিত্রকে, আভিজাত্য সৃষ্টির শিক্ষা-প্রণালীকে রবীন্দ্রনাথ বর্জন করতে বলেছেন। পরাধীন দেশে ইংরেজ শাসকের শিক্ষানীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ ছিল এই যে, ইংরেজ শিক্ষাকে ঘৃণ্য-তরবারি রূপে ব্যবহার ক'রে সমাজটাকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। এই প্রচেষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ ধিক্কার জানিয়েছেন। ইংরেজের এই শিক্ষাবিধিকে বলেছেন : রেলকামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল। কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে সুপ্ত।

কারখানার গাড়িটা যেন সত্য। আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব। (শিক্ষার বিকিরণ) 'শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হল এন্‌লাইটেন্‌ড্‌, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণগ্রহণ।' (শিক্ষার বিকিরণ) দেশের পল্লী এবং গ্রামবাসীদের বিষয়ে যখনই আলোচনা করেছেন, শিক্ষার এই আভিজাত্য সৃষ্টির বিধিকে তিনি নিন্দা করেছেন; লক্ষ্য করেছেন শিক্ষার উচ্চবর্গীয় চরিত্রের মধ্যেই রয়েছে 'সকলের চেয়ে বড় জাতিভেদ, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।' (শিক্ষার বিকিরণ) রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে সিঁড়িতে গাঁথা একটা ইমারতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। একতলার মানুষ যেন সিঁড়ি বেয়ে শিক্ষা ইমারতের ছাদে উঠতে পারে। কিন্তু ইংরেজ সরকার শিক্ষা-ইমারতের সিঁড়ি গোড়া থেকেই রাজমিস্ত্রির প্ল্যানে রাখে নি। ফলে এক তলার মানুষ সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠতে পারবে না। পরাধীন দেশের শিক্ষার এই মস্ত ফাঁকটা রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছে। তিনি তখনকার অনেক রাজনৈতিক নেতাদের বলেছিলেন: দেশের বিরাট জনসাধারণকে অন্ধকার নেপথ্যে রেখে রাষ্ট্ররঙ্গভূমিতে যথার্থ আত্মপ্রকাশ চলবে না। দেখলুম সেকথা স্পষ্টভাষায় উপেক্ষিত হল।' (শ্রীনিকেতনে শিল্পভাণ্ডার উদ্বোধন) দেশ যখন স্বাধীন হলো বিরাট জনসাধারণের অশিক্ষার অন্ধকার দূর হল না; রাষ্ট্ররঙ্গভূমিতে রাষ্ট্রনায়কগণ কেবল আলো-আনার সংকল্প ও সদিচ্ছাই ঘোষণা করলেন।

রবীন্দ্রশিক্ষা বিস্তারের এই উপলব্ধি প্রয়োগ করলে দেখবো, ঔপনিবেশিক যুগের ফাঁকটা সদ্য-পাশ-হওয়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে রয়েই গেছে। সংকল্প ও সদিচ্ছার ঘোষণা রাষ্ট্রনায়কগণ আজও করে চলেছেন। স্বাধীনতার পর থেকে বরাবরই দেশের শিক্ষাবিধিতে এ-ফাঁক ছিল; এবার তা জাতীয় শিক্ষানীতির ছাপটা গায়ে দিয়ে সম্মুখ আগলে এসে দাঁড়াল। দেখলাম, তার চরিত্র উচ্চবর্গীয়, তার পিরামিড চেহারা। পিরামিডের শিখরে উঠবার সিঁড়ি গোড়ায় নেই—রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'সিঁড়ি হারা শিক্ষাবিধান'। ফলে একতলার মানুষ কোনোদিনই এই শিক্ষা পিরামিডের শিখরে উঠতে পারবে না। তবে নবোদয় বিদ্যালয়ের সুউচ্চ ছাদ থেকে বাছাই করা ছাত্রদের পিরামিডের শিখরে সরকারী চণ্ডুতে ক'রে তুলে তুলে

রেখে আসা হবে। সেখানেই তারা সরকারী পিতৃমাতৃস্নেহে পালিত হয়ে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সমকক্ষ হবার যোগ্যতা পেতে থাকবে। আর পিরামিডের গোড়াটা শিখরকে নিঃস্বার্থ ধৈর্যে শিরোধার্য করে নেবে, তার ভার বহন করবে, কিন্তু সুযোগ গ্রহণ করবে না—দাম জোগাবে, মাল আদায় করবে না। এ রবীন্দ্রনাথেরই ক্ষোভের কথা।

রবীন্দ্রনাথ বলতেন যা উৎকৃষ্ট তাতে সকল মানুষের জন্মগত অধিকার। মৃত্যুর এক বছর আগে শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবের ভাষণে বলেছেন ঃ মনে রাখতে হবে শ্রেষ্ঠত্বের উৎকর্ষে সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার।··· আর আমাদের সকলের চেয়ে বড় দরকার শিক্ষার সাম্য। অর্থের দিক দিয়ে এর ব্যাঘাত আছে জানি, কিন্তু এছাড়া কোনো পথও নেই। নতুন যুগের দাবি মেটাতেই হবে। (শ্রীনিকেতনে বার্ষিক উৎসবে ভাষণ) নতুন শিক্ষানীতি 'জাতীয়' নাম ধারণ করলেও জাতির সে দাবি পূরণ করল না। জনসাধারণকে পেছনে রেখে আলোকিত একটা সমাজ তৈরির বিধি প্রণয়ন করল।

শিক্ষাবিষয়ে জাতীয় নীতির এই উচ্চবর্গীয় চরিত্র প্রথম লক্ষণীয় হবে প্রথাভুক্ত শিক্ষার বিকল্প হিসেবে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন পরিকল্পনায়। সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। প্রাথমিক স্কুলশিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে যাবার বয়স হয়েছে দেশের এমন ছাত্রজনসমষ্টিরও বড়ো এক অংশ স্কুলশিক্ষাব্যবস্থার বাইরে থেকে যাবে। দু-ধরনের শিক্ষাবিধানের মধ্যে শিশু সন্তানরা শুরু থেকেই বড়ো হবে।

এই শিক্ষানীতির উচ্চবর্গীয় চরিত্র দ্বিতীয়বার স্পষ্ট হয়েছে আদর্শস্কুল বা নবোদয় বিদ্যালয়ের (space setting model school) পরিকল্পনায়। প্রথাভুক্ত শিক্ষাব্যবস্থায় যারা প্রবেশ করতে পারবে, তাদের মধ্য থেকে অতি ক্ষুদ্র একটা অংশকে বেছে আলাদা করে নবোদয় বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে। বাছাই-এর মাপদণ্ড হবে মেধা। অথচ মেধা সর্বদাই আর্থিক সচ্ছলতা ও সুযোগ এবং অনুকূল আয়োজনের কর্ষিত জমিতে ফলন দেয়। কদাচিৎ দেখা যায় দারিদ্র্যপিষ্ট ঘরে মেধা জঞ্জাল ফাটিয়ে রক্তকরবীতে ফুটে উঠেছে। দেশের সরকার অন্নের, স্বাস্থ্যের সুযোগ সকলের জন্য নিশ্চিত করতে না পারলে কখনই তার পক্ষে নবোদয় বিদ্যালয়ে সকলের প্রবেশ

সুনিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সকলের জন্য নবোদয় বিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগের ঘোষণা আরেকটি বড়ো মাপের আইডিয়া, যার ধ্যানের রূপ নেশার রূপটাই সত্য ; বাস্তবিক রূপটা কোনোদিন বর্তমান ভারতসমাজ কাঠামোতে যথার্থ দেখা যাবে না। এই সামাজিক সত্যের পথে নবোদয় বিদ্যালয়ে প্রবেশ অবারিত থাকবে সমাজের সম্পন্ন অভিজাত ঘরের সন্তানদের কাছে। নবোদয় বিদ্যালয়-প্রণালী ভারত সমাজের উচ্চশ্রেণীর সন্তানদের জনগণ থেকে বেছে আলাদা করার সমাজতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার কাজ করবে। আমেরিকা ইংলণ্ডের মতো উন্নত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দেশে এ ধরনের শিক্ষায়তনে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভবিষ্যৎ ক্যাপটেনদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ব্রিটেনে এ রকম আদর্শ শিক্ষায়তন থেকে ওদেশের সেনাধ্যক্ষদের ৮০ শতাংশ, বিশপদের ৮৩ শতাংশ, বিচারকদের ৮৫ শতাংশ, বিদেশদপ্তরের উচ্চপদের অফিসারদের ৯৫ শতাংশ, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের ৬৭ শতাংশ প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। ছাত্রসমাজের মাত্র ১০ শতাংশ এখানে প্রবেশ করতে পারে। একইভাবে আমেরিকায় এ ধরনের শিক্ষায়তনে ছাত্রসমাজের মাত্র ১৫ শতাংশের প্রবেশাধিকার রয়েছে। এই বৈষম্য লক্ষ্য করেই আমেরিকান শিক্ষাবিদ E. Digby Baltzell মন্তব্য করেছেন, আমেরিকার জনসাধারণ থেকে সম্পদশালী শ্রেণীকে বেছে আলাদা করে রাখার সমাজতাত্ত্বিক কাজ এই সব শিক্ষায়তন সাধন করে—"...serve the sociological function of differentiating upper class in America from the rest of the population." আমাদের দেশের সম্পন্ন ঘরের সন্তানদের সাধারণ দেশবাসী থেকে বেছে আলাদা করার বিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যমান রয়েছে। এবার সরকারী উদ্যোগে ও অর্থব্যয়ে জাতীয় শিক্ষানীতিতে সে বিধান ঘোষিত হলো। এই সব নবোদয় বিদ্যালয়ে ছাত্রসমাজের ০ ৮ শতাংশ মাত্র প্রবেশাধিকার পাবে।

খুবই লক্ষণীয়, আমাদের নতুন শিক্ষানীতির এই উচ্চবর্গীয় চরিত্র সৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নতুন অর্থনীতি। অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত মন্তব্য করেছেন, নতুন অর্থনীতি আর্থিক দিক থেকে সমাজকে প্রকটভাবে দ্বিধাবিভক্ত করে দেবে। 'কার্যত দেখা যাচ্ছে যে, সরকারী নীতি উন্নত প্রযুক্তি ইত্যাদির নাম করে একবিংশ

শতাব্দীতে প্রবেশ সম্বন্ধে রঙিন আশা সঞ্চার ক'রে যে অবস্থাতে দেশকে নিয়ে যাচ্ছে, সেটা হবে আর্থিক দিক থেকে দ্বিধাবিভক্ত সমাজ, যার উপরের তলায় থাকবে বিত্তশালী একটি শ্রেণী, যারা তাদের জীবনযাত্রাতে পাশ্চাত্য-দেশের ধনীজনের জীবনের মানে পে'ৗছে গিয়েছে এবং যার নীচের তলাতে থাকবে একটা বিরাট জনসংখ্যা যারা জীবনধারণের নিম্নতম মানেও পে'ৗছতে পারবে না।' (ইণ্ডিয়ান স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্সের আলোচনা সভায় সমাপ্তি ভাষণ, অক্টোবর ১৯৮১) এই অর্থনীতিরই প্রতিফলন হিসেবে নতুন শিক্ষানীতি শিক্ষার দিক থেকে সন্তান, সমাজ ও দেশকে ভাগ ক'রে দেবে। একদল থাকবে শিক্ষা পিরামিডের শিখরে—তারা আধুনিক সমুন্নত ও অগ্রসর শিক্ষার সর্ববিধ ধারাবর্ষণে অভিষিক্ত হয়ে উপযুক্ত মানুষ হবে। তারা মান পাবে, অর্থ পাবে, তাবা হবে এন্‌লাইটেন্‌ড্, আলোকিত। তারাই হবে একবিংশ শতকের ভারতসমাজের ক্যাপটেন। আব দেশের বৃহত্তম জনসমষ্টি পাবে দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষা, অল্পশিক্ষা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা। এই আলোকিত ক্যাপটেনরা রায় দেবে আর শিখরধারণকারী গোড়ার মানুষেরা সেই রায় 'জো হুজুর' বলে মাথা পেতে নেবে। মুষ্টিমেয় নবোদয়ের পেছনে গোটা দেশটাতে লাগবে পূর্ণগ্রহণের অন্ধকার।

রবীন্দ্রনাথও অর্থনীতি ও শিক্ষানীতির এই পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন ক'রে বলেছিলেন ঃ অর্থ উপার্জনের সুযোগ ও উপকরণ যেখানেই কেন্দ্রীভূত, স্বভাবত সেখানেই আরাম, আরোগ্য আমোদ ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অল্প সংখ্যক লোককে ঐশ্বর্যের আশ্রয় দান করে। [উপেক্ষিত পল্লী] নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি অল্পসংখ্যক ভারতবাসীর জন্য এই ঐশ্বর্যের শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন 'সবচেয়ে বড়ো জাতিভেদ, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা'। এর ফল বিষময়। শহরে, গ্রামে, মানুষে মানুষে বিচ্ছেদের তরবারি দেশের বুকে একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে চালানো হবে। জনহিতকর একটা সরকারের হাতে শিক্ষা-সংস্কৃতি নির্মল তরবারির কাজ করে। তা নির্মল এই জন্য যে তা দেশের সকল সন্তানের মানুষ হবার পথ প্রশস্ত ও পরিষ্কার করে দেয়। আর তরবারি এই জন্য যে তা এই পথ তৈরির ক্ষেত্রে যে-কোনো শত্রুবাধার শিরচ্ছেদ করে। অপর পক্ষে জনগণের শত্রুভাবাপন্ন সরকারের

হাতে শিল্প-সংস্কৃতি ঘৃণ্য তরবারি হয়ে ওঠে। কারণ ঠিক বিপরীত কাজেই এই তরবারিকে সরকার ব্যবহার করে থাকে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থকে বলি দেয় অল্পসংখ্যক মানুষের স্বার্থের হাড়িকাঠে।

রবীন্দ্রনাথ যে উচ্চবর্গীয় শিক্ষাবিধির ঘোর বিরোধিতা করেছেন, সে বিধি ঘোরতর জোরদার হয়ে জাতীয় শিক্ষানীতির নাম ধরে আজ পাকা হলো। দেশের লোকসভায় জনপ্রতিনিধিদের বৃহৎ এক অংশ জনসাধারণকেই বঞ্চিত করার এই শিক্ষানীতি পাশ করালেন এবং এ-হেন কাজ ক'রেও তারা ভারত রাষ্ট্ররঙ্গভূমিতে রাষ্ট্রনায়ক রূপেই বিরাজ করছেন!

সামন্ততান্ত্রিক কুপ্রথার বিরুদ্ধতায় প্রথম বাংলা নাটক ও উপন্যাস

॥ ১ ॥

সামন্ততান্ত্রিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে সচেতন সংগ্রাম শুরু হলো এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যের পর। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ইউরোপের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবরশক্তির ওপর যখন আঘাত করল, আমাদের বহু প্রাচীন সংহত সমাজ আলোড়িত হলো। সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিন্তা, ভাবনা সকল ক্ষেত্রে আমরা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলাম। ইউরোপীয় শিক্ষাদর্শে উদ্ভূত হলো আলোকপ্রাপ্ত এক তরুণ সমাজ। তাদের জাগ্রত মন ও সজাগ চোখের কাছে ভেসে উঠল আমাদের সমাজজীবনে মধ্যযুগের অন্ধকার, সামন্ত বিধিনিষেধ, কুপ্রথা ও কুসংস্কারগুলি। এই সবের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে তারা এগিয়ে এলেন। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে, বালবিবাহের ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে, বিধবা বিবাহের সপক্ষে, নারী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে, কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও আচার সর্বস্বতার বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলন সংগঠিত হলো, জনমত গঠিত হলো। একথা সত্য যে এইসব সংস্কার আন্দোলনের সাধ্য ছিল না সামন্তবাদী কাঠামোর অবশেষের মূলোৎপাটন করা। সামন্তবাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চরিত্রটাও তাদের কাছে খুব স্পষ্ট ছিল না। একদিকে ইংরেজ শাসন অর্থনীতিতে সামন্তবাদকে রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয় দিয়েছে, অপরদিকে রক্ষণশীল গোঁড়াপন্থীরাও সামন্ত ঐতিহ্য রক্ষায় সক্রিয় ছিল। কিন্তু এই সংস্কার আন্দোলন যে সামন্ত কাঠামো ও চিন্তাচেতনাকে সজোরে নাড়িয়ে দিয়েছিল, সেটা ছোটো করে দেখার নয়। সামন্তবাদের ক্লেদাক্ত গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ অভিশাপগুলির বিরুদ্ধতায় আবির্ভাব ঘটল নতুন শক্তিশালী একটা সংস্কৃতির। "এই সংস্কৃতি ইউরোপীয় বুর্জোয়া সংস্কৃতির অনিবার্য প্রভাবের পরিণতি। মানুষের ওপর সামন্ততান্ত্রিক বিধিনিষেধ, গ্রামীণ অন্ধতা এবং ধর্মীয় কুসংস্কারগুলি ধ্বংস করার বিশ্ব বুর্জোয়া সংস্কৃতি বিপ্লবের অংশরূপে এই

সংস্কৃতি জন্মলাভ করে।” সুতরাং এই সংস্কৃতিকে নিশ্চয়ই বলবো পুরনো সংস্কৃতি থেকে পৃথক ও প্রগতিশীল। উনিশ শতকের লেখকদের মধ্যে একাংশ এই নতুন শিক্ষাদর্শ ও সংস্কৃতির অগ্রসর ভূমিকাকে দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করলেন। এই যে নতুন আন্দোলন গড়ে উঠল, এই আন্দোলনে তাঁদের কাজের একটা অঙ্গ হিসেবে তাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সাহিত্যকর্মে এই আন্দোলন সচেতন তীব্রতা লাভ করল এবং তা রূপ পেল কয়েকটি ছড়া ও লোকসঙ্গীত বাদ দিলে সৃজনশীল সাহিত্য হিসেবে বাংলা নাটকে প্রথম। সামন্ত কুপ্রথা বলতে এই সময়-সীমার লেখকগণ কৌলীন্য প্রথা, বালবিবাহ, বহুবিবাহ এবং বাল-বিধবার প্রতি রক্ষণশীল সমাজটার অনবধানতার বিরুদ্ধেই সরব ছিলেন। তার কারণ ছিল সমাজে তখন প্রধানত যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা চালিত হয়েছিল মুখ্যত নারী সমাজের উপর সামন্ত সমাজের চাপানো অন্যায় ও অবিচারগুলির বিরুদ্ধে। নাটক হলো সমাজ ও জাতির দর্পণ। জাতি ও সমাজ সর্বদাই সচল। তার এগিয়ে যাবার ইতিহাস আছে। নাটকে তারই দ্যোতনা থাকে। উনিশ শতকে বাংলা নাটক তার যাত্রালগ্নেই জাতি ও সমাজের দর্পণ হিসেবে জাতীয় জীবনে আবির্ভূত এই নতুন সংস্কৃতিকে এবং সমাজ আন্দোলনের এই ধারাকে রূপায়িত করল।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর ওপর অত্যাচার অবিচার চরমে পেঁৗছায়। পুঁজির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার মতো নারী পুরুষের হাতে ব্যক্তিগত সম্পদ হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের দ্বারা নারীর নিগ্রহ তীব্র রূপ নিল। নারী পারিবারিক দাসীত্বে পরিণত হলো। পরিণত হলো শয়ন কক্ষের দাসীত্বে, আঁতুর ঘর ও রান্নাঘরের দাসীত্বে। এই নিগ্রহ থেকেই বহুবিবাহ প্রথার জন্ম হয়েছে। “পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা”—এই শাস্ত্র নির্দেশকে পুরুষজাতি বহুশত বৎসর মূলধন ক'রে নারীকে গঞ্জে-গঞ্জে, গ্রামে-গ্রামে ক্রয় করেছে। বহু বিবাহের সঙ্গেই যুক্ত কৌলীন্যপ্রথা, বাল-বিবাহ প্রথা। এবং এই তিনের মধ্যেই প্রকট হয়ে উঠেছে সমাজের শ্রেণী বিশেষের স্বার্থ এবং নারীজাতির ওপর পুরুষগত কর্তৃত্বের প্রভাবাধীনতা। বহুবিবাহ, বালবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথার ক্লেদাক্তগর্ভ থেকেই মুখ্যত জন্ম নিয়েছে বাংলার নারীজাতির জীবনে বালবৈধব্য যন্ত্রণা। নবীন শিক্ষাদর্শে

ও সংস্কৃতিতে আলোকিত বাঙালী তরুণরা পুরাতন সমাজটার এই সব বিধিনিষেধ ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুললেন। ১৮২৯ সালে সতীদাহের মতো একটা সামন্ততান্ত্রিক অভিশাপ রামমোহনের হাতে প্রচণ্ড-ভাবে মার খেল। রামমোহনের পরই নবীন সংস্কৃতি ও প্রগতিশীল ভাবধারার প্রতিনিধি হিসাবে দেখা দিলেন বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ। কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে অক্ষয়কুমার দত্ত, কিশোরী চাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ সমিতি' মাধ্যমে জনমত গঠনে উদ্যোগী হলেন। বিক্রমপুরের রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় পূর্ববাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতে লাগলেন। তারও পূর্বে ১৮৪২ সালে 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকা কঠোব যুক্তিবাদের আলোকে এই-কুপ্রথার বিরুদ্ধতা শুরু কবে। বিদ্যাসাগর তাঁব প্রবল সক্রিয়তা নিয়ে এই প্রথাকে "কুৎসিত প্রথা" বলে আখ্যাত ক'রে তা নিবারণের জন্য অবতীর্ণ হলেন। সংবাদ সাময়িক পত্রিকাগুলি এই সকল আন্দোলনে সমর্থন নিয়ে এগিয়ে এলো। ছড়া, লোকসঙ্গীতে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠল ঃ

> "কোন পাপে মোর জন্ম হল কুলীন কুলে।
> দিলেম যৌবন রতন, কাকের মতন
> বুড়ো মামার গলে তুলে।" [রামচন্দ্র চক্রবর্তী]

কুলীন কন্যার এই খেদোক্তি সেদিন ছিল বাস্তব সত্য। কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহের সঙ্গে বালবিধবাবিবাহ আন্দোলন উনিশ শতকে তীব্র রূপ পেল। এই শতকে ইয়ংবেঙ্গলগোষ্ঠী এবং বহু ব্যক্তিত্বের সক্রিয়তায় বিধবা বিবাহের সপক্ষে আন্দোলন বাদানুবাদের স্তর থেকে প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টার স্তরে পেঁাছেছিল। বিদ্যাসাগর এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন। পুরাতন সমাজটার রক্ষণশীল দল এই নবীন সংস্কৃতি ও তার উদ্যোক্তাদের চোখ রাঙিয়ে ক্ষান্ত হলো না, তারা ভীতি প্রদর্শন করতে লাগল। বিদ্যাসাগরকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে উৎপীড়ন ও অপমান করল।

এই সময়কার বাংলা নাট্যকারগণ এই সর্বব্যাপী আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে চাইলেন না।

এই আন্দোলনের ফল ছিল সীমিত সন্দেহ নেই। সীমিত এই

অর্থে বলছি, কারণ এই আন্দোলন নারীজাতির মূল স্বাধীনতার প্রশ্নের কোনো সমাধান করতে পারে নি। এই সব আন্দোলনের ফলেও সামন্ত অভিশাপগুলির উৎস বিনষ্ট হলো না। কিন্তু তার জন্য এই আন্দোলনধারাকে উপেক্ষা করা বা তার মূল্যকে কোনো রকম অকারণ ছোট করে দেখাটা হবে উল্লেখযোগ্য বিভ্রম। এই আন্দোলনপুঞ্জ বাঙালী জীবনে মধ্যযুগের বিদায় ঘণ্টা বাজিয়েছে। মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে জাগরণের পথ দেখিয়েছে। মূল সমস্যার সমাধান না করলেও এই সব আন্দোলন নারী জাতির অধিকার স্বীকৃতির পথ করে দিয়েছে। এত দিনের সামন্ত অভিশাপ ও নিগ্রহের নিকৃষ্ট অবস্থা থেকে মুক্তির দ্বার নারী সমাজের কাছে খুলে দিয়েছে। নারী জাতির মুক্তি আন্দোলনে এ হলো একটা বিশেষ অধ্যায়।

সমাজ এই অধ্যায় রচনায় যখন সক্রিয়, বাংলা নাটক সাগ্রহ সক্রিয়তা নিয়ে এই আন্দোলনের পাশে সাহিত্যিক মিত্র হয়ে দাঁড়াল। পুরাতন সংস্কৃতি ও শিক্ষাদর্শের সঙ্গে নবীন শিক্ষা সংস্কৃতির এই যে সংঘাত শুরু হলো নাট্যকারগণ সেই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত ক'রে তাকে শিল্পকর্ম ক'রে তুললেন। তাঁরা এগিয়ে এসে নারী সমাজের ওপর সামন্ত অভিশাপের বিরুদ্ধে একটা নাট্য আন্দোলন গড়ে তুললেন। সামন্তবিরোধী নাটকের জোয়ার এলো বাংলা নাটকের যাত্রারম্ভে। বাংলা নাটক আরম্ভেই প্রতিবাদী।

এই নাট্য আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৮৫৪ সালে। ১৮৫২ সালে বাংলার প্রথম মৌলিক নাটক রচিত হলেও তা অভিনীত হয়েছিল ব'লে সংবাদ জানা নেই। নাটক অভিনেতব্য শিল্পকলা। অভিনীত না হওয়া পর্যন্ত নাটকের পূর্ণাঙ্গ শিল্পরূপটি বিকশিত হতে পারে না। সুতরাং অভিনেতব্য শিল্প যে নাটক, বাংলা সাহিত্যে তার জন্মলগ্ন ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮৫৪ সালে কুলীনকুলসর্বস্ব রচিত হলো। এ-নাটক একাধারে মৌলিক এবং তা অভিনীত হয়েছে। ততোধিক কুলীনকুলসর্বস্ব বাংলার প্রথম নাটক যা জাতির দর্পণ হয়ে উঠল। সমাজজীবনে যে নতুন জীবন উজ্জীবিত হলো, জাগ্রত জাতি মধ্যযুগীয় দুর্নীতি ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে যেভাবে সোচ্চার হয়ে উঠল, তাকে প্রথম নাটকের উপজীব্য ক'রে তুললেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। এই অর্থেই রামনারায়ণ সমাজের সচল গতিকে

দ্যোতিত করলেন। লক্ষণীয় এই যে, রামনারায়ণ ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত এবং শিখাধারী ব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্য বৈদিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পুরাতন সংস্কৃতি ও শিক্ষাদর্শ ভেঙে যাচ্ছে। প্রাচীন সংহত সমাজটার ওপর আঘাত হানছে নবাবিভূর্ত সংস্কৃতি। এ সব দেখে শুনে রামনারায়ণ সমাজ ও সংস্কৃতি গেল গেল রব তুললেন না। তিনি প্রাচীন সমাজটার গর্ভে যে নিষ্ঠুর ও অ-মানবিক কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহপ্রথা জন্ম নিয়েছিল নতুন শিক্ষার আলোকে তাকে যাচাই ক'রে তার বিরুদ্ধতায় নাটক রচনায় প্রয়াসী হলেন। নাটকে বিবাহিতা কুলীন কন্যা ফুলকুমারীর করুণ কাহিনী শুনে যশোদা বলছে—"নাতনি আর বলিসনে, বলিসনে, বুক ফেটে যায়"—এ হলো সেদিনকার নারী জাতির নিকৃষ্ট অবস্থার আর্তনাদ। যশোদা সমাজের বিধান-প্রদানকর্তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে—"হারে বল্লাল, তুই কাল হয়ে এসেছিলি? কে তোকে কুলের ছিষ্টি কত্যে বলেছিল? কুল ত নয়, এ কুলের আঁটি, বড় কঠিন।" এখানে নারী সমাজ নিকৃষ্ট অবস্থা থেকে মুক্তি চাচ্ছে। সামন্ত অভিশাপের বিরুদ্ধে, প্রাচীন সমাজটার নির্মমতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছে। রামনারায়ণ নাটকে এই জ্বালা, ক্ষোভ জেহাদকে রূপায়িত করে সমাজের প্রতি শিল্পীর দায়িত্ব পালন করেছেন। লক্ষণীয় বাংলা নাটক আরম্ভেই এই স্বচ্ছ দৃষ্টিতে বলিষ্ঠ হয়ে উঠল।

১৮৫৪ থেকে ১৮৭২ এই সময়ে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধতায় কুলীনকুলসর্বস্ব ব্যতীত তারকচন্দ্র চূড়ামণি (সপত্নী, ১৮৫৮), রামনারায়ণ তর্করত্ন (নববিবাহ ১৮৬৬, উভয় সংকট ১৮৬৯), হরিশচন্দ্র মিত্র (সপত্নী-কলহ ১৮৭২), দীনবন্ধু মিত্র (জামাই বারিক ১৮৭২), শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় (বাল্য বিবাহ), রামচন্দ্র দত্ত (বাল্যবিবাহ), শ্যামাচরণ শ্রীমানি (বাল্যোদ্বাহ) প্রমুখ সমাজ আন্দোলনের সপক্ষে সাহিত্যিক মিত্র হিসেবে দাঁড়ালেন।

এই ১৮ বছর সময়সীমায় আন্দোলনের তীব্রতার দিক থেকে বিধবা-বিবাহ সমাজকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করেছিল। এই আন্দোলন প্রাচীন সমাজটার ধর্ম ও শাস্ত্রের গোঁড়ামির দুর্গে একটা প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। দুর্গাধিপতিরা রুখে দাঁড়াল। রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে

রক্ষণশীলরা ৩৬,৭৬৩ জনের স্বাক্ষর-সম্বলিত এক আবেদনপত্র সরকারের কাছে পেশ করল। আরেকদিকে বিদ্যাসাগরের সমর্থনে জেগে উঠল ছাত্র-যুবশক্তি, বুদ্ধিজীবীদের একাংশ। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা গণস্বাক্ষর অভিযান শুরু করল! বাংলা দেশের সাধারণ মানুষ—শান্তিপুরের শ্রমজীবী তন্তুবায়, নির্যাতিত নারী সমাজ বিদ্যাসাগরের পক্ষে দাঁড়ালেন। সরকার ১৮৫৫ সালের ২৬শে জুলাই আইন পাশ করতে বাধ্য হলো। এই বিপুল কর্মকাণ্ডে বাংলার সমকালীন নাট্যকারগণ শিল্পীর দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এলেন। এ যুগের নাট্যকারগণের ভূমিকা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন দেখি সে সময়ে কবি ঈশ্বর গুপ্ত, জনপ্রিয় পাঁচালীকার দাশরথি বিদ্যাসাগরের পাশে শিল্পীর দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়ালেন না, অথচ নাট্যকারগণ তাঁদের শিল্পকর্মের একটা অঙ্গ হিসাবেই বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে নাটক নিয়ে এগিয়ে এলেন। ১৮৫৭ সালে যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের বিধবাবিবাহের সমর্থনে রচিত "চপলাচিত্ত-চাপল্য" নাটক বাংলা সাহিত্যে এক সাহসী নাটক। ১৮৫৫ সালের পরও বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ দিতে গিয়ে বার বার প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন। রাজনারায়ণ বসুর মতো বুদ্ধিজীবী নির্যাতিত হয়েছেন। এই পটভূমিতে যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় ১৮৫৭ সালে তাঁর নাটকে বিধবার বিয়ে দিয়ে সমস্যার ওপর যবনিকা টেনে দিলেন।

১৮৫৫ সালের জুলাইতে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। ১৮৫৬তে উমেশচন্দ্র মিত্র প্রথম বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে সমাজভূমি থেকে সাহিত্য-ভূমিতে তুলে আনলেন। বিধবাবিবাহকে নাটকের উপজীব্য বিষয় ক'রে [বিধবাবিবাহ নাটক] তিনিই প্রথম বাংলার নাট্যকারদের শিল্পীর দায়িত্ব পালনে আহ্বান জানান। কুলীনকুলসর্বস্ব এবং বিধবাবিবাহ বাংলা নাটকের সামন্তবিরোধী ভূমিকার ইতিহাসে দুই মাইলস্টোন। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৮৫৬ সালেই বহু নাটক রচিত হলো। এগিয়ে এলেন উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় [বিধবোদ্বাহ নাটক], রাধামাধব মিত্র [বিধবা মনোরঞ্জন নাটক]; ১৮৫৭ সালে যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় [চপলা-চিত্তচাপল্য], বিহারীলাল নন্দী [বিধবা পরিণয়োৎসব]; ১৮৫৯-এ কেশবচন্দ্র সেন [বিধবাবিবাহ], ১৮৬০-এ শিমুয়েল পীরবক্স [বিধবা

বিরহ], শ্যামাচরণ শ্রীমানি [বাল্যোদ্বাহ], ১৮৬৪-তে যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় [বিধবা বিলাস]।

নাট্যরসোত্তীর্ণতার বিচারে এই নাটকগুলির অধিকাংশই উত্তীর্ণ নয়। নাট্য শিল্পের সূক্ষ্মবিচারে বিচার্য হয়ে এই সব নাট্যকার ও তাঁদের নাটক নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে নামমাত্র হয়ে বিরাজ করছে। নাট্যকারগণ বিস্মৃত, তাঁদের নাটক আজ দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু সমাজ যখন নবীন শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বরণ করবার কর্মযজ্ঞে ব্যস্ত ছিল, তখন যাঁরা সাহিত্যিক মিত্র হয়ে শিল্প কর্মে সেই সমাজসত্যকে দ্যোতিত করলেন তাঁদের নবমূল্যায়ন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস করবে না কি ?

সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে নারীজাতির মূল সমস্যা দূর করবার সংগ্রামে নারী আন্দোলনও তীব্রতর রূপ পরিগ্রহ করেছে! বাংলার বর্তমানের খ্যাতনামা অনেকের নাট্যসৃষ্টিতে তার দ্যোতনা না থাকলেও বর্তমানের বহু সংগ্রামী নাটকে এরই দ্যোতনা রয়েছে। এই সংগ্রামী নাট্যচিন্তা রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষে এবং সংগঠিত নারী আন্দোলনের পটভূমিতে নিশ্চয়ই মূল্যায়ন করবে ঊনিশ শতকের উল্লিখিত নাট্যকারদের, যারা সামন্ত অভিশাপ ও তার চাপানো নিকৃষ্ট অবস্থা থেকে মুক্তির দ্বার নারী জাতির কাছে খুলে দেবার দায়িত্বকে নাট্যকারেরও দায়িত্ব বলে সেদিন দ্বিধাহীন ভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

॥ ২ ॥

কিন্তু লক্ষণীয় ১৮৫৪ থেকে ১৮৬০ এই সাত বছরে নাটকের ক্ষেত্রে যখন বহু লেখক সামন্ত কু-প্রথার বিরুদ্ধে এগিয়ে এলেন, ঐ সময়ে উপন্যাসের ক্ষেত্রে অনুরূপ দায়িত্ব পালন করতে কোনো লেখকই কলম ধরেন নি। একালের সমালোচক বাঙলার 'প্রথম সার্থক উপন্যাসের সম্মান' দিয়েছেন 'আলালের ঘরের দুলাল'-কে। ১৮৫৮ সালে প্যারীচাঁদ মিত্রের এই উপন্যাসখানা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় সামন্ত অভিশাপের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমাজ আন্দোলনকে নাট্যকারগণ ও অক্ষয়কুমার দত্তের মতো প্রবন্ধকারগণ যখন একটা সাহিত্যকর্ম করে তুললেন, সেই সময়কালেই

বাঙালার 'প্রথম সার্থক উপন্যাস' ওবিষয়ে নীরব রইল। ১৮৬৫তে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয়। ১৮৬২তে তিনি এই উপন্যাস শুরু করেছিলেন। ১৮৫৫ সালের ২৬শে জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। বিধবা বিবাহের সপক্ষে নাট্য জোয়ার আসে। বঙ্কিমের সমবয়স্ক কেশবচন্দ্র সেন বিধবা বিবাহ নাটক জনসমক্ষে অভিনীত করেন এবং বিদ্যাসাগর নাট্য প্রদর্শনে দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকেন। অর্থাৎ স্পষ্টত নতুন সংস্কৃতিকর্মীরা সামন্ত প্রথার নির্মম ও অ-মানুষিক সংস্কার ও বিধিনিষেধগুলির বিরুদ্ধে তীব্র আঘাত হেনে চলেছেন। সমাজ ও সাংস্কৃতিক এই জাগরণের পটভূমিতে শিক্ষিত তরুণ, বাঙলার প্রথম গ্রাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রথম উপন্যাসে ইতিহাস ও রোমান্সের রৌদ্রছায়াপথে পরিক্রমণ করলেন। এবং একই পথে লেখনী চালালেন ১৮৭২ পর্যন্ত। ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৮ এই পাঁচ বছরের সীমায় তিনি পরিচিত সমাজ ও সংসারের ভূমিতে নেমে এসেছিলেন। এবং স্মর্তব্য ১৮৭৩-এ বঙ্কিমের উপন্যাসেই বালবৈধব্য প্রথম উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় হলো। দ্বিতীয়বার হলো ১৮৭৮-এ। অর্থাৎ বাংলা উপন্যাসে সামন্ত কু-প্রথার বিরুদ্ধে নাটকের ঐতিহ্য অনুসরণ করে প্রতিবাদী চেতনাকে রূপ দেবার প্রথম সুযোগ এলো। কিন্তু এই বিশেষ সত্যটা লক্ষ্যগোচর হবেই যে ১৮৭৩-এ বিষবৃক্ষে এবং ১৮৭৮-এ কৃষ্ণকান্তের উইলে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন সমর্থিত হলো না। এই দু'খানা উপন্যাসে বঙ্কিম সরাসরি বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের বিরোধিতা করলেন। যে আন্দোলন বাঙলার বাইরে ভারতের দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত, নিম্নশ্রেণী থেকে উচ্চশ্রেণী পর্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, নতুন সংস্কৃতির আলোকপ্রাপ্ত তরুণ সম্প্রদায় যে আন্দোলনের সপক্ষে দাঁড়িয়েছিল, সংহত সমাজটা গেল গেল এই ব'লে গোঁড়া হিন্দুরা ক্ষিপ্ত হয়ে যে-আন্দোলনের পুরোধা বিদ্যাসাগরকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করল, সেই আন্দোলনটা বাঙলার নাটকের মতো বাঙলার উপন্যাসে সমর্থন পেল না। ১৮৭৩ ও ১৮৭৮-এর মাঝখানে ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হলো আলোড়নকারী স্বর্ণলতা উপন্যাস। কিন্তু স্বর্ণলতার উপজীব্য বিষয় ছিল ভিন্ন।

বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ হবার ৩০ বছর পর, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বাংলা

উপন্যাস প্রথম সামন্ততান্ত্রিক এই অভিশাপের বিরুদ্ধে সরব হলো। এই উল্লেখ্য উপন্যাসখানার নাম 'সংসার' এবং লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত।

রমেশচন্দ্রকে সাহিত্যজগতে নিয়ে আসেন বঙ্কিম এবং প্রথমদিকে বঙ্কিমের কলমেই রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। কিন্তু সামাজিক উপন্যাস রচনায় উদ্যোগী হয়ে স্বর্ণলতার মতো কোনো সমস্যাকে তিনি উপজীব্য করলেন না। বঙ্কিমের মতো বিধবা-বিবাহ আন্দোলনটাকে তিনি ভিন্ন এবং বিরুদ্ধ একটা খাতে টেনে নিয়ে গেলেন না। তিনি বলিষ্ঠভাবে সমর্থন করলেন বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকে। 'সংসার' উপন্যাস উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ব পালনের এক বলিষ্ঠ নজির।

বিধবা-বিবাহ আন্দোলন-এর প্রতিক্রিয়া তখনও (১৮৮৬) সমাজে প্রসারিত। বিদ্যাসাগর জীবিত। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিধবা-বিবাহ কার্য চলছে। রাজনারায়ণ বসুর মতো ব্যক্তিত্ব নির্যাতিত হচ্ছেন। রক্ষণশীলদের চাপা ক্রোধ ও বিরুদ্ধ প্রচারের ফল তখনও তীব্র। নব্যশিক্ষিতদের একাংশের মধ্যে তারা বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের বিরোধিতা সৃষ্টি করতে পেরেছে। এই সব দেখে ও জেনে রমেশচন্দ্র এগিয়ে এসে বললেন বিধবা-বিবাহ সামন্ত কু-প্রথার বিরুদ্ধে একটা বলিষ্ঠ সামাজিক আন্দোলন, একে সমর্থন করি।

রমেশচন্দ্রের এই চিন্তা ও সাহস রূপ পেয়েছে উপন্যাসের নায়ক শরতের মধ্যে। কলেজে পড়া তরুণ শরৎ প্রস্তাব করল বালবিধবা সুধাকে সে বিবাহ করবে। এই প্রস্তাবে নগর সভ্যতার কেন্দ্র, প্রগতি ও সংস্কৃতির মধ্যমণি কলকাতা শহরে ভদ্র-অভদ্র নব্য-প্রাচীন সকলের মধ্যে গুঞ্জরণ দেখা দিল। রমেশচন্দ্রের কথায়—ভবানীপুর থেকে কালীঘাট, কালীঘাট থেকে বালিগঞ্জ পর্যন্ত আত্মীয়-অনাত্মীয়, প্রতিবেশী সকলে চমৎকৃত হলেন। কিন্তু সমস্ত বাধা ঠেলে সরিয়ে শরৎ সুধাকে বিবাহ করল। তাকে সাহায্য করল আরেক নব্যশিক্ষিত তরুণ হেমচন্দ্র এবং তার স্ত্রী বিন্দু। গৃহস্থবধূ বিন্দুকে প্রথম ধাক্কার সংকোচ ও দ্বিধা কাটিয়ে উঠে বিধবা বিবাহের সমর্থনে এসে দাঁড়াতে দেখে চমৎকৃত হই। অনুধাবন করতে বিলম্ব হয় না রমেশচন্দ্র বিন্দুকে এনেছেন বাঙলার নারীসমাজকে বিধবা বিবাহ আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। বাংলা সাহিত্যে সবলা নারী চরিত্র নেই তা নয়।

কিন্তু সামন্ত কু-প্রথার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল সমাজটার ক্রোধ ও অসন্তোষের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আলোড়িত আন্দোলনের সপক্ষে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পল্লীবধূ বিন্দু বাঙলা সাহিত্যে এক বিশেষ মর্যাদার চরিত্র হয়ে রয়েছে। বধূকে নিয়ে শরৎ কলকাতায় পলাতক হয়ে রইল না। সুধাকে নিয়ে শরৎ পল্লীগ্রামে গিয়েই উঠল। সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া শরৎ জানত। কিন্তু তাকে মোকাবিলা করবার মানসিক দৃঢ়তা নিয়েই সে পল্লীসমাজে প্রবেশ করল। ক্রুদ্ধ 'গ্রামস্থ লোক প্রথমে তাদের সহিত আহার ব্যবহার করিলেন না।' প্রাচীন সংহত সমাজটার স্তম্ভ যে গ্রাম-প্রধানরা তারা বিধান দিল বিধবা বিবাহের অপরাধের ও অধর্মের জন্য শরৎকে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে সমাজে উঠতে হবে। কিন্তু শরৎ রুখে দাঁড়াল—'আমি যে কার্যটি করিয়াছি তাহা পাপ বলিয়া মনে করি না, ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব না।' বাঙলা উপন্যাসে এই প্রথম পুরানো শিক্ষা ও নতুন শিক্ষার সংঘাত প্রতিফলিত হলো এবং নতুন শিক্ষা জয়ী হলো।

বিদ্যাসাগরের নেতৃত্ব যে সৎসাহস ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শাস্ত্রীয় গোঁড়ামির দুর্গকে আক্রমণ করেছিল, তারই সাহিত্যিক মিত্র হিসাবে রমেশচন্দ্র গোঁড়ামির প্রাচীর বেষ্টিত আস্তানার এবং বিধানের শিরে আঘাত করলেন। বিদ্যা-সাগরের পাশাপাশি থেকে সেদিন রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ নির্যাতন সহ্য করে বিধবাবিবাহ দিয়েছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী 'আত্মচরিত' গ্রন্থে লিখেছেন, "আমি শৈশবধি বিদ্যাসাগরের চেলা ও বিধবা বিবাহের পক্ষে।" রমেশচন্দ্র ১৮৮৬তে উপন্যাসের মাধ্যমে রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির পাশে দাঁড়িয়ে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রতি লেখকের দায়িত্ব পালন করেছেন, অপর দিকে এই তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলনের বিরোধী দলকে তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধ নিয়ে আঘাত করেছেন। বিদ্যাসাগর বিরোধী সর্ব-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদেরই, তিনি শুধু আঘাত করেন নি, তাঁর ব্যঙ্গ কশাঘাত তীব্র হয়ে পড়েছে নব্যশিক্ষিত আন্দোলন বিরোধী দলের ওপরও। রমেশচন্দ্রের বহু বছর আগে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের জোয়ার মুখে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও নব্য শিক্ষিতদের চরিত্রের সৎসাহসের অভাবকে, দেশ-হিতৈষিতার অভাবকে আঘাত করেছিলেন।

১৮৮৬তে রমেশচন্দ্র নব্যশিক্ষিতদের অন্তঃসারশূন্য ও অনগ্রসর এই

অংশটাকে চাবুক মারলেন। তিনি এদের প্রাচীন সংহত সমাজটারই স্থূলস্তম্ভ বলে অভিহিত করেছেন। সংসার উপন্যাসে হরিশংকর কর্মকার, যদুনাথ এই দলের প্রতিনিধি। পাশ্চাত্য সভ্যতার অবতার মিস্টার কর্মকার। তার কোটপেণ্টলুন অনিন্দ্যনীয়, চক্ষের চশমা অনিন্দ্যনীয়, গলার নেকটাই অনিন্দ্যনীয়।...ইংরেজী বুলি বিস্ময়কর, ইংরেজী ধরন বিস্ময়কর, ইংরেজী মেজাজ বিস্ময়কর। নব্যতন্ত্রের সাফাই দিয়ে মদের গেলাস ধরেই থাকেন, আর যদুনাথের মুখে ইংরেজী বুলি যেন খই ফোটে। ইংরেজী চালবোল ইংরেজী খানায়, ইংরেজী ধরনে তার জুড়ি নেই। হিন্দু সমাজটার নাকের ওপর ঘুষি মেরে ইনি গো-জিহ্বা আস্বাদন করেন। আবার ন্যাশনালিটির ওপর তার বক্তৃতা চমকপ্রদ। এহেন হরিশংকর ও যদুনাথবাবু যখন শুনলেন শরৎ বিধবাবিবাহ করবে, "হিন্দুধর্মের স্থূল স্তম্ভস্বরূপ হরিশংকরবাবুর হাত হইতে সুধাপাত্র পড়িয়া শতখণ্ড হইয়া গেল। বলিলেন, "হা ধর্ম! তোমাকে কি সকলেই বিস্মৃত হইল? ভদ্রলোকের এ কি অধর্ম আচরণ? হিঁদুয়ানি আর বুঝি থাকে না।" "শিক্ষিত যদুনাথের হস্ত হইতে কাঁটা-ছুরি পড়িয়া গেল। সম্মুখের গো-জিহ্বা অনস্বাদিত রহিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, আর বুঝি ন্যাশনালিটি থাকে না।"

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পাশে সেদিন কতখানি বলিষ্ঠ সমর্থন নিয়ে রমেশচন্দ্র দাঁড়িয়েছিলেন। মৃত্যুশয্যায় বিদ্যাসাগর তাঁর আদর্শের উত্তরাধিকারী তরুণদের অনুরোধ করেছিলেন, এই কর্তব্য সম্পাদন করতে তাঁরা যেন অবিরাম প্রচেষ্টা চালায়। রমেশচন্দ্র তাঁদেরই একজন। কেশবচন্দ্র সেনের বিধবাবিবাহ নাটকে বিদ্যাসাগর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার' উপন্যাস নিশ্চয়ই তিনি পড়েছিলেন। কারণ বিধবাবিবাহের আয়োজন যেখানে হয়েছে, অর্থ দিয়ে সামর্থ্য দিয়ে তিনি সেই চেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিধবাবিবাহের অনুকূলে যেখানে সাড়া উঠেছে তিনি পুলকিত হয়েছেন।

রমেশচন্দ্রের মানসিক একটা প্রস্তুতি ঘটেছিল যেখানে বিধবাবিবাহ আন্দোলন সহজে সাড়া জাগিয়েছিল। ১৮৬৮তে ২০ বছর বয়সে রমেশচন্দ্র সমুদ্র পাড়ি দেন। আই. সি. এস. পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৭১ সালে বাঙলায় ফিরে আসেন। দেশের মাটিতে নেমে তরুণ রমেশচন্দ্র

দেখলেন তাঁকে উদ্যোগী হয়ে যাঁরা সম্বর্ধনা জানালেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র। এই তিন ব্যক্তিই বিধবাবিবাহ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়। রমেশচন্দ্র সেদিন নিশ্চয় এর তাৎপর্য লক্ষ্য করেছিলেন। 'সংসার' উপন্যাসে তিনি সমুদ্রপাড়ি সম্পর্কে সামাজিক রক্ষণশীলতার তীব্রতার কথা উল্লেখ করেছেন। তারও একযুগ আগের গোঁড়ামি ও বিরূপতার মধ্যে ইংলণ্ড প্রত্যাগত রমেশচন্দ্রকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর ও ইয়ংবেঙ্গল নেতৃত্ব—এ ঘটনা রমেশচন্দ্র দত্তের জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ভারতের জাগরণের উপাদান আলোচনা করতে গিয়ে অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে একটি উপাদান হিসাবে মার্কস বলেছিলেন,—"ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় তাদের খুব বাঞ্ছিত না হলেও এক ধরনের শ্রেণী গড়ে উঠছে, যারা ইউরোপের বিজ্ঞানে আলোকপ্রাপ্ত এবং শাসনব্যবস্থা পরিচালনার প্রয়োজন মেটাতে পারে।" রমেশচন্দ্র নিঃসন্দেহে এই শ্রেণীভুক্ত। ইউরোপের বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও নতুন শিক্ষার অনিবার্য প্রভাব তাঁকে আলোকিত করে। নবজাগরণের 'টিপিক্যাল হিউম্যানিষ্ট' বিদ্যাসাগরের হিন্দুশাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করে বিশুদ্ধ যুক্তি দিয়ে বিধবাবিবাহ সমর্থন করার উদ্যোগ নব্যশিক্ষিত রমেশচন্দ্রকে আকৃষ্ট করে। নতুন শিক্ষা ও পুরাতন শিক্ষা; পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভারতীয় শিক্ষার সংঘাতে তিনি বিনা দ্বিধায় নতুন শিক্ষাদর্শকে গ্রহণ করেন। তার প্রথম দৃশ্যমান প্রকাশ ঘটল ইংলন্ড থেকে ভারতের মাটিতে পা দিয়ে তিনি সংবর্ধনার উত্তরে বক্তব্যের মধ্যে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বললেন। নারী শিক্ষা প্রবর্তন, নারী-পুরুষের সমানাধিকার দাবির মধ্যে নতুন শিক্ষাদর্শের বৈপ্লবিক ভূমিকাই প্রতিফলিত। সুতরাং রমেশচন্দ্র ভারতে আবির্ভূত নতুন সংস্কৃতির ও শিক্ষাদর্শের যে পরিমাণে সমর্থন করেছেন, তদনুপাতে তিনি সামন্ত কু-প্রথা ও বিধিনিষেধের বিরুদ্ধতা করেছেন। বাঙলা সাহিত্যে উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই সরব বিরোধিতা ঘটল ১৮৮৬তে 'সংসার' উপন্যাসে।

আরও লক্ষ্য করার এই যে 'সংসার' উপন্যাসখানা বঙ্কিমচন্দ্র পরিচালিত 'প্রচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উপন্যাসখানা তিনি কোনো একজনকে নয়, তিনজনার নামে উৎসর্গ করেন। তাঁরা হলেন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কণ, রাজপুত জীবন সন্ধ্যা ইত্যাদি ঐতিহাসিক উপন্যাস উৎসর্গ করতে পারতেন। বঙ্কিমের কলমেই তিনি এসব রচনা করেন। কিন্তু সামন্ত বিধিনিষেধ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ সংগ্রামী পদক্ষেপ নিয়ে যে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর অগ্রসর হয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রকে এই উপন্যাস উৎসর্গ করার কারণ কি? বঙ্কিম তো খোলাখুলি বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধতা করলেন! "বঙ্গভাষায় গদ্য-সাহিত্য বঙ্কিম স্বহস্তে সৃষ্ট ও ভূষিত করেছেন"—এই যদি কারণ হয়, তাহলে পূর্বকথিত উপন্যাস-গুলির একখানা উৎসর্গে বাধা কোথায় ছিল? এই সূত্রে কতগুলো প্রশ্ন জাগে। রমেশচন্দ্র কি বিধবা বিবাহের সমর্থনে রচিত এই উপন্যাসখানা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বঙ্কিমকে উৎসর্গ করে সামন্ত কু-প্রথার বিরুদ্ধে সংঘটিত আন্দোলনের প্রতি সাহিত্যিকের দায়িত্ব সম্পর্কে বঙ্কিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন? একই উদ্দেশ্য নিয়েই কি তিনি বঙ্কিমেব পত্রিকায় উপন্যাসখানা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন? অথবা তিনি কি বঙ্কিমের চিন্তার সংকট লক্ষ্য করে তাঁকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন? বঙ্কিম নতুন সংস্কৃতি ও শিক্ষাকে গ্রহণ করেন নি এ-কথা সত্য নয়। এই নতুন সংস্কৃতি সাহিত্য ক্ষেত্রে যে নব নব উন্মেষ আনয়ন করল বঙ্কিম তাতে অংশ গ্রহণ করলেন। আধুনিক সাহিত্যফসল উপন্যাসকে তিনি গ্রহণ করলেন। শিল্প-রীতির ক্ষেত্রে রূপান্তরকে গ্রহণ করলেন। কিন্তু বঙ্কিম চিন্তার সংকটে ভুগছিলেন। নতুন শিক্ষা এবং পুরাতন শিক্ষা, পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং ভারতীয় শিক্ষা—দুয়ের মধ্যে যে সংঘাত দেখা দিল, বঙ্কিম তার মধ্যে পড়ে দোদুল্যমান ছিলেন। এ-জাতীয় সংকট নব্যশিক্ষিত অনেকেরই মধ্যে সেদিন ছিল। এই দোদুল্যমানতার কারণ প্রাচীন ও সংহত সমাজটার প্রতি তাঁরা মোহমুক্ত হতে পারেন নি। এবং রক্ষণশীলদের প্রভাবমুক্ত হতে পারেন নি। এই সংকটেরই প্রতিফলন বিধবাবিবাহ সম্পর্কে 'সাম্য' গ্রন্থে বঙ্কিমের মন্তব্যে —"বিধবা বিবাহ ভালও নহে মন্দও নহে…। সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল। যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্বপতিকে আন্তরিক ভালবাসিয়া ছিল, সে কখনই পুনর্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না; যে জাতিগণের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে,

সে জাতির মধ্যেও পবিত্র স্বভাব বিশিষ্ট স্নেহময়ী বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না।" 'বিধবার আন্তরিক ভালবাসা', 'চারিত্রিক পবিত্রতা', 'সতীত্ব' ইত্যাদি যে সব কথা বলে হিন্দুসমাজ দীর্ঘকাল বিধবাদের চোখ রাঙিয়ে রেখেছে, বঙ্কিম সেই যুক্তিই প্রয়োগ করেছেন। এ যুক্তিতে ফাঁক এবং দুর্বলতা, চিন্তার সংকট স্পষ্ট। সাম্য গ্রন্থে বঙ্কিম নারীশিক্ষা সম্পর্কে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিচয় দিয়েছিলেন অথবা জমিদারদের সম্পর্কে যে প্রতিকূল মন্তব্য করেছিলেন পরবর্তী কালে 'সাম্য' গ্রন্থের প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়ে তিনি তাঁর চিন্তার প্রবল সংকটের পরিচয় নতুন করে দিলেন। বস্তুতঃ উনিশ শতকের নবজাগরণ, ইংরেজী শিক্ষার প্রসার, পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির প্রাবল্য বঙ্কিমের বুদ্ধিকে স্পর্শ করেছিল। কিন্তু তাঁর শিল্পীমনকে মোহমুক্ত করেনি। বরং তাকে কুয়াশার মতো আচ্ছন্ন করে ছিল হিন্দু পুনরুজ্জীবন, হিন্দু ধর্মের সংস্থাপনা, হিন্দু ধর্মসম্মত নৈতিক মূল্যমান, প্রচলিত নীতিবোধ। কখনও কখনও একে অতিক্রম করতে চেয়েও তিনি সক্ষম হন নি। এই সংকট থেকেই বঙ্কিম সোজাসুজি বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করতে পারেন নি। আর একই কারণে বঙ্কিম 'প্রচার' পত্রিকায় রমেশচন্দ্রের উপন্যাসকে প্রকাশ করতে অস্বীকার করতে পারেন নি। বঙ্কিমকে এই উপন্যাস উৎসর্গের পেছনে রমেশচন্দ্রের মনে কি ছিল জানি না। কিন্তু কতগুলি ঘটনা আমাদের ভাবতে সুযোগ দিয়েছে যে রমেশচন্দ্র সেদিন সাহিত্য সম্রাটের কাছে সামন্ত অভিশাপের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনে ঔপন্যাসিকের ভূমিকার প্রশ্নটি তুলে ধরেছিলেন।

১৮৫৭ সালে যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'চপলাচিত্তচাপল্য' নাটকে বিধবার বিয়ে দিয়ে সমস্যার ওপর যবনিকা টেনে দিয়েছিলেন। সেদিন তা ছিল সাহিত্যে এক দুঃসাহসী কাজ। ১৮৮৬তে উপন্যাসে সেই কাজ করলেন রমেশচন্দ্র। তিনি বিধবা সুধাকে শরতের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সমস্যার ওপব যবনিকাপাত করলেন। দুঃসাহস আরও লক্ষণীয় এই জন্য যে ১৮৮৬তে সংসার উপন্যাসের ১৭ বছর পর বিশ শতকের অগ্রসর সমাজ-ভূমিতে 'চোখের বালিতে' রবীন্দ্রনাথ কিংবা ৩১ বছর পর শরৎচন্দ্র তাঁর 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে বিনোদিনী ও রমাকে বাঙলার সমাজ থেকে দূরে

পবিত্র কাশীতে প্রেরণ করেছেন কামনা-বাসনায় অশান্ত বিধবার চিত্তকে বিশ্বনাথের দর্শনে ও করুণার কলুষহর স্পর্শে সংযত করবার জন্য।

অথচ বিস্ময়কর এই যে বাংলা উপন্যাসের গবেষকগণ রমেশচন্দ্রের এই উপন্যাসে বিশেষত্ব কিছুই দেখতে পান নি। তাঁরা রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে পাতার পর পাতা আলোচনা করেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণতা লাভ করেছে, না রমেশচন্দ্র সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা এ নিয়ে তাঁরা পাণ্ডিত্য এবং পরিশ্রমের পরিচয় দিয়েছেন। এ তথ্য জ্ঞাতব্য সন্দেহ নেই। কিন্তু রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসকে তাঁরা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"প্রথম দৃষ্টিতে ইহার মধ্যে [সংসার উপন্যাসে] কিছু বিশেষত্ব দেখা যায় না, কোনরূপ উচ্চাঙ্গের সৃজনীশক্তি, উচ্চস্তরের সমালোচনা লক্ষ্য হয় না।" শেষ দৃষ্টিতে তিনি সংসার উপন্যাসে যে বিশেষত্ব দেখেছেন তা হলো শিল্প-রীতির **Jane Austen**-এর মতো সহজ সরল ঘটনা বিরল প্রাত্যহিক জীবনদর্শন ও চিত্রণের নৈপুণ্য। এবং তৎসঙ্গে দেখেছেন গভীর বিশ্লেষণযোগ্য জটিলতার অভাব, বঙ্কিমসুলভ জীবনের রহস্যময় দুর্জ্ঞেয়তা, জীবন সমস্যার জটিলতা, জীবনের চরম মুহূর্তগুলির ভাবৈশ্বর্য গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারার ক্ষমতার অভাব। শুধু শ্রীকুমারবাবু নন, আজ পর্যন্ত প্রবীণ ও নবীন কোনো খ্যাত গবেষক কোনো দৃষ্টিতেই দেখতে চান নি যে 'সংসার' উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে সামন্ত অভিশাপের বিরুদ্ধে প্রথম সরব উপন্যাস। দেখতে পান নি, নারী জাতির ওপর সামন্ত কুপ্রথার আঘাতের বিরুদ্ধে যে অধ্যায় উনিশ শতকে রচিত হচ্ছিল 'সংসার' সেই কর্মযজ্ঞে উপন্যাসের মহৎ দায়িত্ব নিয়ে সাহিত্যিক মিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অথবা বিশ্লেষণ করতে চান নি বাঙলার যথার্থ প্রথম সামাজিক উপন্যাসের দাবিদার 'সংসার'। ১৯৭২

রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব

॥ ১ ॥

পত্রিকায় দেখলাম বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্র প্রমুখরা বোধ করছেন রবীন্দ্রনাথ বিপন্ন; তাঁকে রক্ষা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথকে রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করবেন। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩রা ও ৭ই মে) আর একটি পত্রিকা তার সম্পাদকীয়তে লিখেছেন, "......এ দেশে আজকাল বারোয়ারীর ধুম পড়েছে। উৎসব ব্যসনে শোকে সন্তাপেও বারোয়ারীর আয়োজন। রবীন্দ্র জন্মতিথি পালনে, ভক্তি নিবেদনে আমাদের আপত্তি নাই। **আপত্তি বারোয়ারী ভক্তিতে।**...গত কয়েক বছর রবীন্দ্র জন্ম উৎসব পালনের যে প্রথা প্রবল আকারে দেখা দিয়েছে তার কোথাও একটা অসুস্থ উত্তেজনা আছে এমন সন্দেহ হয়। সহরের পাড়ায় পাড়ায় পল্লীতে পল্লীতে ইদানীং অতি সমারোহে বারোয়ারী পুজোর মতো কবির জন্মতিথি পালিত হচ্ছে।...মনে করি বারোয়ারী রবীন্দ্র-উৎসব পালনে তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন করছি।..." (দেশ, সম্পাদকীয়, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৩)

যাঁরা 'বারোয়ারী রবীন্দ্রোৎসব' পালনের বিরোধী, তাঁরাই আবার দেখা গেল বারোয়ারী মুক্ত মেলার বিশেষ উদ্যোগী। দুঃখের বিষয় অঙ্কুরেই তা' শুকিয়ে গেল। তাঁদের উদ্যোগের অভাবে নয়—জনসাধারণের সমর্থনের অভাবে। কাজেই তাদের হঠাৎ রবীন্দ্রনাথকে রক্ষা করার উদ্যম দেখলে সন্দেহ জাগে।

॥ ২ ॥

আমাদের দেশের শাসক শ্রেণীর অনুগত পত্র-পত্রিকা পণ্ডিতগণ, উদারপন্থী পত্রিকা ও পণ্ডিতগণ, এবং সেই সব পত্রপত্রিকা পণ্ডিতগণ যারা নিজেদের নিরপেক্ষ বলে জাহির করেন, তারা রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে দেখছেন? রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক-গবেষক-পুস্তকলেখকগণ রবীন্দ্র-

মেলায়, বিদ্যায়তনে, বক্তৃতায় গণমাধ্যমগুলিতে কবিকে কীভাবে তুলে ধরছেন? রবীন্দ্রমঞ্চ থেকে তারা অবিরত প্রচার করছেন রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতাতত্ত্ব, ছোটো আমি বড়ো আমি তত্ত্ব, তাঁর সীমা-অসীম, খণ্ড-অখণ্ড তত্ত্ব, প্রকৃতিপ্রেম তত্ত্ব, রহস্যময়তা, সূক্ষ্মতা, আত্মময়তা, অধ্যাত্মময়তা। ধূপের ধোঁয়ায়, চন্দনের প্রলেপে তারা রবীন্দ্রনাথকে জগন্নাথ করেছেন। অতীতে রবীন্দ্র জীবৎকালে এরা তাঁর ঔপনিষদিক তত্ত্ব প্রচার করতেন। কবি ক্ষুব্ধ হয়ে এদের বিরুদ্ধতায় অবতীর্ণ হন। আজ কবির জীবনাবসানের সুযোগে সেই প্রতিহতদের উত্তরসূরীরাই আবার রবীন্দ্রমঞ্চ থেকে অনুষ্ঠান শুরু করেছেন। একটু চালাকি করছেন উদার-পন্থীরা। তাঁরা কবিকে প্রগতিশীল, আধুনিকতার হোতা ইত্যাদি বিশেষণ দিয়ে ভূষিত করছেন। কবির দৃষ্টির প্রসারতা, সংস্কার-মুক্তি, দেশপ্রেম, আন্তর্জাতিকতা দেখাচ্ছেন। কিন্তু সর্বদাই এই উভয়দল চেষ্টা করছেন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপাদান-গুলিকে যতটা সম্ভব আড়ালে রাখতে, কবির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বলিষ্ঠ ভূমিকাকে আড়ালে রাখতে। তাঁর মনীষা ও হৃদয় যেখানে গ্রামের গরিবের জন্য ভেবেছে, পল্লীভাবনা যেখানে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে, নিজেকে জনসাধারণের কবি বলে পরিচয় দিতে যেখানে তাঁর গৌরব হচ্ছে, সামাজিক অবিচার অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেখানে তিনি ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করেছেন এবং শোষণমুক্তির কথা বলেছেন—সে সব দিককে এরা লোকচক্ষুর আড়ালে কবর দিতে চান।

কবির জন্মশতবর্ষ যখন উদ্‌যাপিত হলো, ভিয়েতনামে তখন সাম্রাজ্য-বাদের রক্তলোলুপ নৃত্য চলছে; ইন্দোচীনে সাম্রাজ্যবাদের কাঁটামারা বুটের আঘাত আর তার নির্লজ্জতা চলেছে। কিন্তু উদারপন্থীরা, নিরপেক্ষরা, শাসকদল সাম্রাজ্যবাদ আর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এশিয়া মহাদেশেরই এক কবির ধিক্কারকে ও প্রতিবাদকে গুরুত্ব দিয়ে দেখালেন না। রবীন্দ্রমেলা থেকে বাঘা বাঘা রবীন্দ্র ভক্তগণ রবীন্দ্রনাথের "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব" ইত্যাদি কথাগুলো উদাত্ত কণ্ঠে বলছেন ঃ কারণ তার শেষে যে রয়েছে ধরনীতলকে কলঙ্ক শূন্য করতে করুণাঘন বুদ্ধের আবাহন। এই কথাগুলি তুলে ধরবার সুবিধা আছে। এর মধ্যে হিংসা,

যুদ্ধ, রক্তপাতের বিরোধিতা আছে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের ওপর ঘৃণা ও ক্ষোভের প্রকাশ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেখানে সাম্রাজ্যবাদের 'বিনিপাত' কালান্তরের বহু প্রবন্ধে ঘোষণা করেছেন, সাম্রাজ্যবাদকে যেখানে নেকড়ের নখর ও দন্তের সঙ্গে তুলনা করে তার কাঁটামারা জুতোর বীভৎসতাকে ধিক্কার ও ঘৃণা জানিয়েছেন, সেই কথাগুলি এবা সাধারণের কাছে তুলে ধরবেন না, ব্যাখ্যা করবেন না। অতীতেও এঁরা ও এঁদের পূর্বসূরীরা তা করেন নি। কংগ্রেস নেতৃত্ব, এক শ্রেণীর জ্ঞানীগুণীরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রবীন্দ্রনাথকে সেদিনও সুনজরে দেখেন নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। ভারতের বহু খ্যাত ব্যক্তিই এই যুদ্ধের প্রতি সমর্থন ও আনুগত্য জানালেন। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস তার বার্ষিক অধিবেশনের মঞ্চ থেকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করলেন এবং প্রতিদান হিসাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধির দ্বারা সম্মানিত হয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। সেদিন গান্ধীজীও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে সমর্থন করে যুদ্ধে একজন স্বেচ্ছাসেবক হলেন, 'I thought that England's need should not be turned into our opportunity and that it was more becoming and far sighted not to press our demands while the war lasted. I therefore adhered to my advice and invited those who would to enlist as volunteers" [An Autobiography —M. K. Gandhi]. গান্ধী, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ যখন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে সমর্থন করেছেন রবীন্দ্রনাথ তখন এই যুদ্ধকে কি দৃষ্টিতে দেখেছেন? রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের হোতাদের 'আব্রুমুক্ত মাতালে'র সঙ্গে তুলনা করলেন এবং যুদ্ধের 'ভীষণ উদগ্রমূর্তি''কে, 'মিথ্যা ও বীভৎস হিংস্রতা'কে, 'উন্মত্ত বর্বরতা'কে কষাঘাত করলেন। কবি ক্ষুব্ধ হলেন সাম্রাজ্যবাদের সেই রূপকে ভারতে জালিয়ানওলাবাগে দেখে। এই ঘৃণা থেকেই, মানবতার ওপর সাম্রাজ্যবাদের এই লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের প্রতিবাদেই কবি ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া নাইট খেতাব বর্জন করলেন। রবীন্দ্রনাথের এই বলিষ্ঠ প্রতিবাদ এবং ভারতে ব্রিটিশ ভাইসরয়কে লেখা অগ্নিগর্ভ চিঠি সেদিন বিশ্বে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে অসুবিধায় ফেলেছিল। কিন্তু সেদিনের নেতারা কবির এই ভূমিকার বিরুদ্ধতা করলেন। তার

কলঙ্কিত উদাহরণ অমৃতসর কংগ্রেস। গবর্নর জেনারেলের একসিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্য স্যার শংকরণ নায়ার যিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তাঁর বার্ষিক ৬৪ হাজার টাকার বেতনের চাকরি ছেড়ে দিলেন, কিন্তু ব্রিটিশ রাজের দেওয়া নাইট খেতাবটি ছাড়তে পারলেন না, তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি প্রস্তাব কংগ্রেসে পাস হল। কিন্তু নাইট খেতাব ত্যাগের জন্য রবীন্দ্রনাথকে নন্দিত করে যে প্রস্তাব পেশ হয়েছিল তা কংগ্রেসে তুলতেই দেওয়া হল না। [দ্রষ্টব্য 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'—মজফ্ফর আহ্মদ]

রবীন্দ্রনাথকে রক্ষার ভণিতা করার ধৃষ্টতা যাঁদের হয়েছে, তাঁদের রবীন্দ্র ভক্তির এই হলো স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে সুন্দরকে দেখবার চোখ আমাদের খুলে দিয়েছেন, রোমাণ্টিকতার একটা সুস্থ ও বলিষ্ঠ ভিত রচনা করে দিয়েছেন, প্রকৃতির সঙ্গে কথা বলতে শিখিয়েছেন, প্রকৃতির গোপন, উপেক্ষিত মণিকোঠায় প্রবেশ করবার পথ দেখিয়েছেন—এসব দিককে আমরা অভিনন্দিত করব নিশ্চয়ই। কিন্তু কেবল এদিকগুলিকেই বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে নানাখানা করে প্রচার করে কবির প্রতিভার পূর্বকথিত জীবন্ত উপাদানগুলিকে চাপা দেবার কৌশল ও প্রচেষ্টাকে আমাদের নিন্দা করা উচিত এবং তার বিরোধিতা করা সমীচীন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তা করেছেন। এতদিন এঁরা এখানে সেখানে এই নিন্দার কাজ করে বেরিয়েছেন। আজ সে কাজের বিরোধিতা দেখে তারা দিবালোকে কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের মূর্তির পাদদেশে দাঁড়িয়ে জনসাধরণের কাছে ঘোষণা করবার চেষ্টা করছেন—রবীন্দ্রনাথকে রক্ষা করুন। জনসাধারণই রবীন্দ্রনাথকে যথার্থ রক্ষা করবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের কোন্ সব গুণ দেখে তারা রবীন্দ্রনাথকে রক্ষা করবেন? সেইসব গুণ দেখে যা তাদের কাজে লাগবে, তাদের উজ্জীবিত করবে, যা তাদের সন্তানদের হিত করবে, তাদের সেবা করতে সক্ষম হবে, সন্তানদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। একটি বড়ো প্রতিভার মধ্যে এই যেসব উপাদান থাকে সে সবকে প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে কাজে লাগাতে হয়, ভবিষ্যতের কাছে তুলে ধরতে হয়, জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা করতে হয়। বড়ো প্রতিভার জন্মোৎসবের এখানেই সার্থকতা। টলস্টয়ের

লেখা আলোচনা করে লেনিন দেখিয়েছেন তাঁর মধ্যে অনেক দুর্বলতা, অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের সম্পদও রয়েছে প্রচুর। এই 'না' ও 'হ্যাঁ'র মধ্যেই টলস্টয়। প্রতিক্রিয়ার শক্তি টলস্টয়কে একটা মঞ্চরূপে ব্যবহার ক'রে সেই মঞ্চ থেকে তাঁর সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতাকে, 'না'র দিককে অনর্গল প্রচার ক'রে তাঁর রচনার গণতান্ত্রিক উপাদানকে আড়াল করে এসেছে। কারণ সেদিকটা তুলে ধরবার বিপদ আছে। প্রতিক্রিয়ার অস্তিত্বের পক্ষে বিপদ। তারা টলস্টয়ের 'ঈশ্বর ও সত্য' ধারণাকে, পাপের প্রতি বলপ্রয়োগ না করার নীতি (non-resistance to evil) ইত্যাদিকে বড় করে তুলে টলস্টয়কে এক নূতন শুদ্ধ মানবতার প্রবক্তা, নৈতিক আত্মশুদ্ধির মহান শিক্ষক ও ঋষিরূপে প্রচার করছে। কিন্তু যেখানে টলস্টয় কৃষকদের যুগযুগের দাসত্ব, রাষ্ট্রীয় শোষণ, অত্যাচার, বঞ্চনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্র ও চার্চকে এবং জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানাকে তীব্র ও কঠোর মনোভাব নিয়ে আঘাত করেছেন, যেখানে ধনতন্ত্রের বিপদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন, সেই সব দিককে এরা লোক-চক্ষুর আড়ালে কবর দিতে চায়। টলস্টয়কে নিয়ে প্রতিক্রিয়ার এই চাতুর্য ও কার্যকলাপকে লেনিন আঘাত করলেন। টলস্টয়ের রচনার সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা একদিকে দেখিয়ে দিলেন, সীমাবদ্ধতার কারণ দেখালেন; আরেকদিকে তাঁর রচনার ও দৃষ্টিভঙ্গির গণতান্ত্রিক দিক তুলে ধরলেন ভবিষ্যতের কাছে। "এল এন টলস্টয়" নামক প্রবন্ধে লেনিন লিখছেন—

"উদারপন্থীরা বড় করে তুলে ধরেন, 'টলস্টয় ছিলেন বিবেকপন্থী"। এ জাতীয় কথা কি শূন্যগর্ভ বাক্‌বৈশিষ্ট্য নয় যা অন্তত হাজারোভাবে Novoye Vremya এবং এ-জাতীয় পত্র পত্রিকায় বার বার বলা হয়েছে? এটা কি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমস্যা সম্পর্কে টলস্টয় যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তাকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া নয়? এটা কি টলস্টয়ের বুদ্ধি ও বিচার শক্তিকে সরিয়ে রেখে তাঁর সংস্কারের দিকটাকে, টলস্টয়ের প্রতিভার যে অংশ অতীতের সামগ্রী, ভবিষ্যতের সম্পদ নয় সেই অংশটাকে, টলস্টয় শ্রেণী স্বৈরশাসনের প্রতি যে প্রবল প্রতিবাদ তুলেছিলেন তাকে এড়িয়ে তাঁর রাজনীতির প্রতি অনীহা ও নৈতিক আত্মশুদ্ধির দিকটাকে একেবারে পুরোভাগে নিয়ে আসার কৌশল নয়?"

এই কৌশল সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে লেনিন রাশিয়ার শ্রমজীবী মানুষকে আহ্বান করেছেন টলস্টয়ের প্রতিভার ভবিষ্যতের সম্পদকে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাখ্যা করার ও তুলে ধরবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে।

রবীন্দ্রনাথকে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন করলে কি দাঁড়ায়? রবীন্দ্রনাথ জন্মেছেন সামন্ত-তান্ত্রিক পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যে, লালিত হয়েছেন ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে। সামন্ততান্ত্রিকতা ও ঔপনিবেশিকতা থেকে যে সব দুর্বলতা আসে, ভগবৎময়তা, রহস্যময়তা, ভাববাদী মানসিকতা দেখা দেয় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তা রয়েছে। আবার পারিবারিক ঐতিহ্য, সামাজিক নানা প্রভাব, পাশ্চাত্যের আধুনিকমনন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বহির্দেশিক ঘটনাস্রোত, রাজনৈতিক সমস্যা ইত্যাদি দেশব্যাপী যে মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল রবীন্দ্রনাথকেও তা প্রভাবিত করেছে। এই পরিব্যাপ্ত পরিমণ্ডল থেকে তাঁর মধ্যে অগ্রসর চিন্তার উজ্জ্বলতা যেমন এসেছে, কবির দৃষ্টিভঙ্গিতে নানা স্ববিরোধ, অনেক সীমাবদ্ধতাও দেখা দিয়েছে। অনেক 'না' এবং অনেক 'হ্যাঁ'-র বিরোধ-দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথ এক বহমান সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে জেগে উঠেছেন। পরাধীন ভারতের কর্মজগতে, চিন্তার জগতে শ্রেষ্ঠ ভারতবাসী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এই পটভূমিতেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁর রচনার ভবিষ্যতের সম্পদরূপ উপাদানগুলি বিচার ও ব্যাখ্যা করা উচিত। সামন্ততান্ত্রিক শোষণের কদর্যতা ও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে কবি যেখানে ঘৃণা ও অভিযোগ প্রকাশ করেছেন, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার মূঢ়তার মারকে যেখানে তিনি ধিক্কার জানিয়েছেন, শিক্ষার জাগরণী শক্তির কথা যেখানে বলেছেন, শিক্ষার সংকোচনের ও শিক্ষা দিয়ে শ্রেণী বৈষম্য, জাতিভেদ অস্পৃশ্যতা সৃষ্টির বিরুদ্ধতা যেখানে করেছেন, বিজ্ঞান মনস্কতা জাগ্রত রেখে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যেখানে দাঁড়াতে বলেছেন এক্ষণে সে সব কথা জনসাধারণের মধ্যে ব্যাখ্যা করা খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি ধনতন্ত্রের শ্রীহীন কুবেরী অর্থস্ফীতিকে ধিক্কার দিয়েছেন, মূলধন ও মজুরীর মধ্যে অত্যন্ত ভেদ থেকে ডিমোক্রাসির যে বিপদ আসছে সে বিষয়ে সতর্ক করেছেন। ধনতন্ত্রের স্ববিরোধ সম্পর্কে কবি একটা ধারণা করতে

চেয়েছেন এবং অর্থ ও প্রতাপ যেখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবাহিত হতে পারে না সেখানে যে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রহসন, সে বিষয়ে সজাগ করে দিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, নাৎসীবাদ ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের ঘৃণা ও প্রতিবাদ ছিল তীব্র। যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল বলিষ্ঠ। শান্তির সপক্ষে তাঁর আবেগ, ভাবনা ও প্রচার ছিল সোচ্চার। জীবনের শেষভাগে তিনি সামাজিক সমস্যার সমাজতান্ত্রিক সমাধান পছন্দ করেছেন। এসবই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির ও সৃষ্টিকর্মের সদর্থক দিক, সম্পদের দিক। এই সম্পদ জনসাধারণের মধ্যে ও ভবিষ্যতের কাছে ব্যাখ্যা করা ও তুলে ধরা খুবই প্রয়োজন। তাতে করে সংস্কৃতির ঐতিহ্যে প্রজন্ম উজ্জীবিত হবে, অগ্রসর হবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর সাহিত্য কর্মের এই সব দিককে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

তাঁর প্রতিভার এই সম্পদ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন বলেই নিজেকে জনসাধারণের লোক বলে আখ্যাত হবার গৌরব করতে সাহসী হয়েছেন।

অবশ্য টলস্টয় যেমন বুঝতে পারেন নি, রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ বুঝতে সমর্থ হন নি শোষণ-পীড়ন-সামাজিক কঠোর সমস্যার উৎসটা কোথায়; সুরাহার যথার্থ পথটা কি। সামন্ততন্ত্রের অভিশাপ, ধনতন্ত্রের আকাশচুম্বী দম্ভের অন্তঃসারশূন্যতা তাঁরা বুঝেছেন, কিন্তু তাঁদের এসবের বিরুদ্ধতা আসল শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে কেন্দ্রীভূত করতে পারে নি। এই জন্যই উভয়ের ক্ষেত্রে শোষণ-বিরোধিতা, সমস্যা-সমাধান অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তিগত যন্ত্রণা ও প্রতিবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে, ভাববাদী চেষ্টা হয়ে দেখা দিয়েছে। দুই মহান প্রতিভার এই সীমাবদ্ধতার কথাও জনসাধারণের মধ্যে ব্যাখ্যা করা উচিত।

স্বাধীনতা উত্তরযুগে গত দুই দশক-এ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের এই সব সম্পদকে ব্যাপক ব্যাখ্যা ও প্রচার করা হচ্ছে। দেশের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী সংস্থাগুলি, ট্রেড ইউনিয়ন, গণপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ক্লাব ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি, গ্রামের সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার এইসব উপাদানকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য মঞ্চ বেঁধে দিচ্ছে। দেশজুড়ে জনসাধারণের স্বকীয় উদ্যোগের এই সব বারোয়ারী মণ্ডকেই শঙ্করপ্রসাদ মিত্র প্রমুখরা, 'দেশ'-এর

মতো পত্রিকা নিন্দা ক'রে বলেছেন অসুস্থ উত্তেজনা, বারোয়ারীভাঁড়, রবীন্দ্র-বিপন্নতা। জনসাধারণের রবীন্দ্রচর্চার উদ্যোগের মধ্যে এ'রা ভয়ের কিছু দেখেছেন! ভয় থেকে নিন্দা করার ইচ্ছা জাগে। আবার ভয় থেকে নানা কূটকৌশলও আসে। বিপন্ন রবীন্দ্রনাথকে রক্ষা করার দায়িত্ব ঘোষণা এমনতর একটা কপট কৌশল।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যে বিবরগোষ্ঠীর লেখক দল

বর্তমানে দেশে দু'টি লক্ষ্য করার মতো ঘটনা ঘটেছে—গোয়া কংগ্রেস কনফারেন্স এবং একখানা উপন্যাস নিয়ে আদালত। এই দুই থেকে মনে হয়েছে, ভারতবর্ষের বর্তমান শাসকশ্রেণীর সঙ্গে এদেশের একশ্রেণীর লেখকের বড়োই মিল আছে। গোয়া কংগ্রেস কনফারেন্সে মনে হলো, বর্তমান শাসকবর্গ এদেশের মানুষের সকল রকম সমস্যার সুরাহা করেছেন, কেবল মদ্যনিরোধ আইন প্রণয়ন করাটা বাকি ছিল। সেই বাকি কাজটা এবার সাঙ্গ করতে তারা গোয়া কনফারেন্সে প্রবলভাবে উদ্যোগী হয়েছেন। [মদ্যনিরোধ নিয়ে তাদের মাতামাতি এতদূর বিসদৃশ হয়ে উঠেছিল যে সরকার পক্ষের বড়ো বড়ো খবরের কাগজ পর্যন্ত কটাক্ষ ও বিরক্তি প্রকাশ না করে পারে নি।] এর পাশে সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে একশ্রেণীর পত্রিকার আলোচনার সমারোহ দেখে, 'প্রজাপতি' নামে উপন্যাস নিয়ে দিনের পর দিন আদালতে বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের সাক্ষ্যগ্রহণ পড়ে মনে হলো এসব লেখকরা আমাদের বর্তমান দেশের, বর্তমান সমাজ ও পরিবারের মধ্যে যথার্থ যা দেখার সে দেখা পূর্বেই সাঙ্গ করেছেন। কেবল বাকি ছিল বিবরের অন্ধকারটা দেখা। এবার তারা পচা গর্ত ও নালী ঘেটে সেই বাকি দেখাটাই দেখাতে নেমেছেন। দু'য়ের মধ্যে মিল হলো, এ দেশের জনজীবনের প্রধান ধারার সঙ্গে শাসকশ্রেণীর সম্পর্ক যেমন গভীর নয়, অনুরূপ দেশের মানুষের সঙ্গে এই গোষ্ঠীর লেখকদের হৃদয়ের সংস্রবও সুগভীর এবং সর্বদা বিদ্যমান নয়। দ্বিতীয়ত উভয়েরই লক্ষ্য দেশের বর্তমান জীবনপ্রবাহের বাস্তব সত্যটাকে এড়িয়ে চলা, তাকে ভিন্নমুখী করার চেষ্টা করা।

বুদ্ধদেব বসু, সমরেশ বসু, উমাপতি বসু, সম্রাট সেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষ ঘোষ প্রমুখ লেখকদল বর্তমান সমাজের অন্তর্লোক দেখতে গিয়ে দেখেছেন নৈশপানশালা, ফিরিঙ্গি পল্লী, অভিজাতের প্রাসাদ,